তুর্কি বসন্ত

(' তুর্কির অতিত, বর্তমান ও ভবিষ্যত' নিয়ে লেখা বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিগণের কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি)

মাওলানা রাবে হাসানি নদভি

মাওলানা নজরুল হাফিজ নদভি

মাওলানা সালমান হুসাইনি নদভি

প্রফেসর মুহসিন উসমানি কাসেমি

মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর

সাঈদ আহমাদ খান নদভি অনূদিত

উৎসর্গ

মমতাময়ী মা এবং জন্মদাতা বাবাকে, যাঁরা আমাকে গড়ে তুলতে নিজেদের তিলে তিলে শেষ করছেন! আর এখনো আমার জন্য বটগাছের মতো ছায়া দিয়ে চলছেন। আল্লাহ তাদেরকে দীর্ঘজীবী করুন! আমীন!

অনুবাদের একেবারে শেষ প্রান্ত, ঠিক তখনই নানাজানের মৃত্যু সংবাদটা শুনতে পাই! দুআ করি, পরপারে তিনি নৈকট্যশীলদের কাতারে থাকবেন! আমীন!

তুর্কি বসন্ত

সাঈদ আহমাদ খান নদভি অনূদিত

স্বত্ব: সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ

বর্ষ: ২০২১

মূল্য: ২৮০

সূচিপত্র

বহু গ্রন্থপ্রণেতা, শাইখুল হাদিস মুফতি হিফজুর রহমান দা. বা.' র অভিমত...১০
পূর্বকথা...১২
তুরস্কে ইসলামি বসন্ত, ...১৭

মুরশিদে মিল্লাত আল্লামা রাবে হাসানি নদভি

খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র...১৮

অতিত ও বর্তমান...২০

তুরস্কে রাবেতা আদাবির কনফারেন্স...২১

নতুন বসন্ত, নতুন সমারোহ...২২

ষড়যন্ত্র! সফলতার সোপান...২৬

* * * * *

তপ্ত মরু প্রান্তরে বসন্ত কাফেলার ভিড়, ...২৯

আল্লামা নজরুল হাফিজ নদভি

রাবেতা আদাবে ইসলামির কনফারেন্স...৩১

কুস্তুন্তুনিয়া...৩২

হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ.' র তুর্কি সফর এবং তুরস্ক নিয়ে তাঁর ভাবনা...৩৩

সফলতার রহস্য ও আলি মিয়া নদভি রহ.' র লেখনীর প্রভাব..৩৪

হজরতের সাথে এরদোগানের সাক্ষাত..............................৩৬

এ্যারদোগানের সফলতার নেপথ্যে..................................৩৭

কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়...৪২

অনন্যময় তুর্কি জাতি...৪৩

* * * * *

তুর্কি' অতিত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ...৪৫

মাওলানা সালমান হুসাইনি নদভি

ভূমিকা..৪৬

উসমানি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ..৪৯

বিপর্যয় শুরু...৫৬

আমিরুল মুমিনিন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ রহ...............৫৭

শৈশব ও শিক্ষা- দীক্ষা...৫৭

শাসনামলের বৈশিষ্ট্য...৫৮

ক্ষমতা থেকে অপসারণ ও নির্বাসন..................................৫৯

ইহুদি ষড়যন্ত্র...৬২

ক্রুসেডারদের অপচেষ্টা...৬২

রাখে আল্লাহ, মারে কে?..৬৬

এরদোগান, যেনো সময়ের সুলতান আব্দুল হামিদ...............৬৮

নাজমুদ্দীন এরবাকান, মিল্লি গুরুশ ও রিফাহ পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং এরদোগানের সক্রিয়তা..৭০

যেমন কুকুর তেমন মুগুর..৭২

তৃতীয় সহস্রাব্দী, তুরস্কের নয়াদিগন্ত ও এরদোগানের কর্মকৌশলতা..৭৩

এরবাকানের মৃত্যু ও এরদোগানের একক কর্তৃত্ব.................৭৬

২০১১, আরব বিশ্বের সংকট আর তুরস্কের নতুন যুগে পদার্পণ..৭৮

এরদোগানের বিরুদ্ধে আমেরিকার ষড়যন্ত্র এবং আল্লাহর সাহায্য..৮০

* * * * *

ইস্তাম্বুলে যেনো বসন্তের হাওয়া বয়ে চলছে, ...৮৩

ড. প্রফেসর মুহসিন উসমানি (কাসেমি নদভি)

' আল ইত্তেহাদুল আলামি' র কনফারেন্স........................৮৪

তুরস্ক ও আরব সম্পর্ক..৮৫

মিসর ও তিউনিসিয়া..৮৭

রজব তৈয়ব এরদোগান ও ফাতহুল্লা গুলেন.....................৮৮

ইস্তাম্বুল শহর..৯০

সুলতান আব্দুল হামিদ আর বর্তমান আরব শাসকবৃন্দ............৯১

সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও তুরস্ক..................................৯৩

* * * * *

এ জয় গণতন্ত্রের নয়, বরং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির.......................৯৬

উরিয়া মাকবুল জান

* * * * *

পশ্চিমা সভ্যতা এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি এরদোগানের বার্তা..১০৩

মাওলানা নাদীমুর রশীদ

* * * * *

রাষ্ট্রের জন্য এরদোগানের অবদান..............................১১০

মাওলানা আব্দুল মুনঈম ফায়েয

রাষ্ট্রের জন্য এরদোগানের অবদান..............................১১১

অর্থনৈতিক পদক্ষেপ..১১১

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি..................................১১৩

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন....................................১১৪

রাজনৈতিক সফলতা..১১৪

* * * * *

সেনাবিদ্রোহের মূল হোতা কে এই ফাতহুল্লাহ গুলেন?...১১৮

মূল লেখকের নাম অপ্রকাশিত

ফাতহুল্লাহ গুলেনের জীবনবৃত্তান্ত.......................................১১৯

মতাদর্শের পরিবর্তন ও প্রচার পদ্ধতি...............................১২৩

এরদোগান ও গুলেন..১২৬

* * * * *

নয়া তুরস্কের বৈপ্লবিক সৈনিক ইমাম সাঈদ নুরসি...............১২৮

ইহসান কাসেম সালেহি

ভূমিকা...১২৯

জন্ম...১৩১

জ্ঞানার্জন...১৩১

নুরসি যখন যুদ্ধের সিপাহসালার.......................................১৩৩

নতুন চিন্তার উন্মেষ; কুরআনই আমার শিক্ষক...................১৩৫

দেশান্তর...১৩৮

রসায়েলে নুর প্রকাশের ইতিহাস.......................................১৩৯

প্রচার পদ্ধতি..১৪০

মৃত্যু..১৪১

* * * *

নাজমুদ্দীন আরবাকানের নামে মুফাক্কিরে ইসলাম আলি মিয়া নদভি রহ.' র চিঠি...১৪৩

* * * * *

উসমানি খেলাফত কালের রেখে যাওয়া কিছু নিদর্শন...১৪৭

মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর

* * * * *

বসফরাস প্রণালী...১৫৪

লুজান চুক্তি ও ২০২৩...১৫৭

চুক্তির শর্তাদী..১৫৮

ধারাসমূহ...১৫৮

২০২৩' র পর কী করবে তুরস্ক?................................১৫৮

লক্ষ্যের পথে কতোটুকু অগ্রসর হলো?...........................১৫৯

জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকার সুনামধন্য প্রধান মুফতি, বহু গ্রন্থপ্রণেতা, শাইখুল হাদিস মুফতি হিফজুর রহমান দা. বা.' র অভিমত:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হামদ ও সালাতের পর,

সুলতান আব্দুল হামিদকে ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাস হস্তান্তরের জন্য ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু উম্মাহ দরদি খলিফা আব্দুল হামিদ মুসলিম ভূখণ্ডের একচুল মাটি ছাড়তেও রাজি হননি।

এটা হলো সুলতান উসমান বিন আরতুগ্রুল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উসমানি খেলাফতের সর্বশেষ শক্তিধর বাদশাহর একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। খেলাফতে উসমানিয়ার দীর্ঘ প্রায় সাতশো বছরের মুসলিম ইতিহাস এমন অগণিত ঈমানদীপ্ত ঘটনার ভরপুর সাক্ষি।

মেধা, বিচক্ষণতা, কৌশল আর ধর্মীয় চেতনা ও অনুভূতি, এগুলো তুর্কি জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। যুগের পর যুগ মুসলিম বিশ্বে ইসলামি চেতনাকে ধরে রাখার যে খেদমত তারা পেশ করেছে, তা মূলত এ সকল গুণের বদৌলতেই সম্ভব।

কিন্তু আজ সেই ঝলমল ঐতিহ্যময় ইতিহাস সমাপ্তির প্রায় একশো বছর হতে চলেছে। বিশ্ব পরিস্থিতি যেনো নতুন করে ডাকছে চেতনার বাতিঘরদের। হাদিসে এসেছে,

إن الله ليبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد دينه

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রতি একশো বছরের মাথায় একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি সমাজের দূরাবস্থা দূর করে মানুষকে ইসলামের দিক নির্দেশনা দেন। [১]

হাদিস শরিফের এ ভাষ্য আমাদেরকে নতুন করে আশার প্রদীপের শুভসংবাদ দেয়। ইনশা আল্লাহ অতিশীঘ্রই বর্ষিত হবে আলোর ফোয়ারা। উন্মোচিত হবে মুসলিমদের নতুন দিগন্ত।

বক্ষমান বইটি সেই নতুন দিগন্তের দিকে ছুটন্ত শাহসোয়ারদের প্রচেষ্টার বর্ণনাই যেনো পেশ করেছে। খুবই তরতর গতিতে লিখেছেন আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা সাঈদ আহমাদ খান নদভি। আরবি, বাংলায় লিখিত উদীয়মান এ তরুণ লেখকের আরো কয়েকটি বই বেশ সারা জাগিয়েছে। আমি হৃদয়ের গহীন থেকে লেখকের জন্য শুভকামনা করি। দুআ করি, আল্লাহ যেনো লেখক ও তাঁর এ লিখনীকে দ্বীনের জন্যে কবুল করে নেন! আমীন!

মুফতি হিফজুর রহমান
প্রধান মুফতি, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

---

১ আবু দাউদ, হাদীস- ৪২৯১, সাখাবী, হাদীস- ১৪৯, আলবানী, সিলসিলা সহীহা- হাদীস, ৫৯৯, ফাতহুল বারী, ১৩/ ২৯৫

পূর্বকথা

বিসমিহি তাআলা

একটি সময় ছিলো, মুসলিম খলিফাদের দাপটে বিশ্ব তখন থরথর করে কাঁপতো। ইসলামি খেলাফতের সুবাদে হিন্দু, মুসলিম, ইহুদি, খৃস্টান নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের সুখসমৃদ্ধ জীবন যাপনে মুসলিম খলিফাদের উদার হস্ত ভূমিকা ছিলো। তখন মানুষেরা পৃথিবীতেই যেনো অনাবীল শান্তির স্বর্গীয় সুখ ভোগ করতো। কিন্তু উসমানি খেলাফত ধ্বংসের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম শাসন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মিটে যায় ইসলামি খেলাফতের সে সুবিস্তৃত প্রভাব। মুসলিম বিশ্ব জুড়ে চালানো হয় নির্যাতন আর নিপীড়নের স্টীম রোলার।

এরপর জুলুম ও নির্যাতনের দীর্ঘ যুগ পার হয়ে আজ মুসলিম বিশ্বে যেনো বসন্ত নতুন বার্তা বয়ে আনছে। আজ চতুর্দিকে যেনো ইসলামের সুবাস ছড়াচ্ছে। ইনশাআল্লাহ বেশি দূরে নয়, যেদিন পৃথিবীর আকাশে কালিমার পতাকা পতপত করে উড়বে।

আমরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। আমরা কুরআনে বিশ্বাস করি। আমাদের রব দৃঢ়তার সাথে সুসংবাদ দিয়েছেন,

فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا

নিশ্চয় কষ্টের পরে সুখ রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের পরে সুখ রয়েছে। সুরা ইনশিরাহ, আয়াত- ৫-৬

আল্লাহর এ দৃঢ় বাণীই আমাদের আশা ও বাসনা এবং সান্তনা ও সমবেদনার একমাত্র সুরক্ষিত দূর্গ। আল্লাহর কালামে বিশ্বাস করে আমরা বলতে পারি, মুসলিমগণ একদিন তাদের এ অধঃপতন থেকে নিস্তার পাবেই। আফগানিস্তান, তুর্কিস্থান, পাকিস্তান, আজারবাইজান, তাজিকিস্তান, এমনকি মিসর, সিরিয়া- সবখানেই যেনো আজ ইসলামের মৌমাছিরা গুনগুন করছে। মধু আহরণে ছুটছে এ-ফুল থেকে ও-ফুলে। আজ চতুর্দিকে যেনো মুসলিম নবীন- তরুণেরা বিজয়ের গান গাইছে। ইনশা আল্লাহ অতিশীঘ্রই আমরা ফিরে পাবো আমাদের হারানো ঐতিহ্য। হয়ত এ শতাব্দীই হবে ইসলামি শতাব্দী। যে শতাব্দীর ফুল হয়ে বাঁচতে চাই আমরা। হে আল্লাহ, তাই যেনো হয়! যারা এই দুআয় আমীন বলছে, সুরভিত ফুল হয়ে তারাও যেনো বাঁচতে পারে, সে কামনাই করি! যে ফুলের সুগন্ধিতে মোহিত হবে মানুষ ও মানবসমাজ!

এরদোগান। তিনি আমাদের এরদোগান। তিনি সময়ের এরদোগান। তিনি মুসলিমদের এরদোগান। উম্মতে মুসলিমার প্রতি তাঁর দরদ ও ব্যথা অতুলনীয়। জাতির জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দুআ করি, মুসলিম নারীরা যেনো যুগে যুগে তাঁর মতো বীর উপহার দিতে পারে! আজকের এই পুস্তক সেই বীরের বিরত্বগাঁথা ও তাঁর জন্মভূমিকে নিয়েই লেখা।

বক্ষমান বইটি মূলত বিশ্ববরেণ্য কতক ব্যক্তিত্বের উর্দু ভাষায় লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। বিশেষকরে নদওয়াতুল উলামার মহাপরিচালক প্রিয় উস্তাদ আল্লামা রাবে হাসানি নদভি দা.বা., নদওয়াতুল উলামার আরবি সাহিত্য বিভাগের প্রধান আল্লামা নজরুল হাফিজ নদভি দা.বা., মাওলানা সালমান হুসাইনি নদভি দা.বা. এবং প্রফেসর ডক্টর মুহসিন উসমানি নদভি দা.বা. সহ ভারত ও পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিক্ষবিদগণের অনেকগুলো প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তুরস্কের ইতিহাস ঐতিহ্য, এরদোগানের অবদান, নাজমুদ্দীন এরবাকান, ফাতহুল্লাহ গুলেন, লুজান চুক্তি, সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ এমন অনেক বিষয়ই ফুটে এসেছে প্রবন্ধগুলোর ছত্রে ছত্রে।

প্রিয় উস্তাদ আল্লামা রাবে হাসানি নদভি এরদোগানের সফলতা নিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় খুবই চমৎকার লিখেছেন।

উস্তাদ মাওলানা নজরুল হাফিজ নদভির লেখায় এ্যারদোগানের সফলতার কারণ ও রহস্য, তুর্কি জাতির বৈশিষ্ট্য, তুরস্কের নবজাগরণে হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ.' র লেখনীর প্রভাব সহ অনেক বিষয়ই সততা ও আমানতের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

মাওলানা সালমান হুসাইনি নদভির প্রবন্ধ কলেবরে ছোটো হলেও পুরো তুর্কি ইতিহাসটা সংক্ষিপ্তাকারে ও সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

উস্তাদে মোহতারাম আল্লামা রাবে হাসানি নদভি এবং উস্তাদ মাওলানা নজরুল হাফিজ নদভি ' র লেখা দু' টো ভারতের প্রসিদ্ধ

উর্দু পত্রিকা ' তামিরে হায়াত' এ প্রকাশিত হয়েছিলো। সেখান থেকে জমা করে মাওলানা সালমান হুসাইনি নদভি পৃথক পুস্তিকার রুপ দেন। সাথে ' তুর্কি, মাজি, হাল আওর মুস্তাকবেল ' নামে নিজের প্রবন্ধটি বৃদ্ধি করে নিজস্ব মাকতাবা থেকে ছেপে দেন।

এই তিনটি প্রবন্ধ সেখান থেকেই অনুবাদ করি। এর সাথে মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর কর্তৃত প্রস্তুতকৃত ' বসফরাস কে কিনারে' থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং প্রফেসর মুহসিন উসমানি নদভির লিখিত একটি চমৎকার লেখা চয়ন করা হয়।

পরিশেষে নয়া তুরস্কের বৈপ্লবিক সৈনিক ইমাম সাঈদ নুরসি রহ.' র জীবনি নিয়ে ইরাকের বিখ্যাত আলেম শায়খ ইহসান কাসেম সালেহির ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির অনুবাদও সংযুক্ত করি।

১৯২৩ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ইসলামি খেলাফত ধ্বংস করে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করে। আজান, ইসলামি শিক্ষা, বিধি- বিধান সব কিছুতেই পাবন্দি আরোপ করে। সেখান থেকে নকশাবন্দি পীর- মাশায়েখ আর একদল অকুতোভয় ইসলামি চেতনাশীল ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় একটু একটু করে তুরস্ক তার হারানো ইতিহাসের দিকে ছুটছে। এর পেছনে কী ছিলো তাদের রূপরেখা? কেমন ছিলো তাদের প্রচেষ্টার ধরণ? এসব বিষয়ে আমাদের ধারণাগুলো অনেকটা অস্পষ্টই। তাই সে অস্পষ্টতা ও সংশয় নিরসনে এক বৈঠকে পড়ার মতো সংক্ষিপ্তাকারের এমন একটি পুস্তকের প্রয়োজন বহু দিন ধরে অনুভব করছিলাম। সেই প্রয়োজন পুরো করতেই অপরিপক্ক হাতের ক্ষুদ্র এই প্রয়াস।

অবশেষে যা আল্লাহর রহমতে শেষ হয়েই গেলো। আলহামদু লিল্লাহ।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই বন্ধুবর প্রিয় মুহসিন হাবীব নদভিকে। তাঁর উৎসাহ প্রদান আর প্রচেষ্টা না হলে কাজটা অপূর্ণই থাকতো। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন!

সামান্য এ খেদমতটুকু আল্লাহ যেনো তাঁর দ্বীনের জন্যে কবুল করে নেন! একে আমাদের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দেন, সে দুআই করি। আমীন!

সাঈদ আহমাদ খান নদভি

নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ

২৪/ ৩/ ২০২০ ইং

রাত ৭.২৫

তুরস্কে ইসলামি বসন্ত

মূল

হজরতুল আল্লাম সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানি নদভি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খৃস্টান ষড়যন্ত্র

শুরুতেই কবি ইকবালের কথা মনে পড়ছে। প্রাচ্যের কবি আমাদের ডক্টর ইকবাল বড়ো জোশ ও আবেগ নিয়ে বলেছেন-

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے

نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر

'নীল দরিয়ার উপকণ্ঠ হতে সদূর কাশগর, এক হও মুসলিম হেফাজতে কাবার'

কবি ইকবাল এ পংক্তিটি বলেছিলেন, যখন ইউরোপীয় খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর মুসলিম বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের প্রভাবে হারামাইন শরিফকে তুর্কি সালতানাত থেকে পৃথক করা হচ্ছিলো। অথচ শতো শতো বছর ধরে তা এই শক্তিধর সাম্রাজ্যের অধীনেই ছিলো।

ইউরোপিয়ানরা বিশ্ব মুসলিম বিশেষকরে, তুর্কিদের থেকে ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলো। তাই সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে ভেতরে পরস্পর ভাষা ও জাতিগত সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি প্রজ্বলিত করে তারা মুসলিমদের ঐক্যের শক্তিকে টুকরো টুকরো করতে চাচ্ছিলো।

তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অর্থনৈতিক সংকট আর শিক্ষাগত অবক্ষয়কে তখন তারা নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। সুযোগ বুঝে ইউরোপ ও ব্রিটেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে নিজেদের কুটনৈতিক পরিকল্পনার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। মুসলিম দেশগুলো থেকে নিজেদের পছন্দসই লোক নির্বাচন করে মুসলিম নির্মূলের ধ্বংসাত্মক পায়তারা করে।

ইউরোপের এসব ষড়যন্ত্রে প্রথমে তুর্কিস্তান এরপর সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শুধু ইসলাম অবমাননাই নয়, বরং ষড়যন্ত্রের এমন ছক আঁকে যে, মুসলিমদের পরস্পরে যেনো হিংসা- বিরোধের লু- হাওয়া বইতে থাকে। মনে হচ্ছিলো, যে সাম্রাজ্য পৃথিবীর একমাত্র বৃহৎ শক্তিধর ও উন্নত শিক্ষা- সংস্কৃতির বাহক হিসেবে ছয়- সাতশো বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছে, তা আজ থেকে ঘুণে ধরা কাঠের মতো ধ্বংসের বেড়াজালে আক্রান্তই রয়ে যাবে! এখন থেকে মুসলিমদেরকে যেনো ইউরোপীয় জাতি- গোষ্ঠির সেবক ও অনুগত হয়েই কাজ করতে হবে। দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণী হয়েই থাকতে হবে। বিষয়টা অত্যন্ত ব্যথাতুর ছিলো। যা তখন আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। কবি বলেন-

مراکش جا چکا فارس گیا اب دیکہنا یہ ہے

کہ جیتا ہے ترکی کا مریض سخت جاں کب تک

‘বেশিদিন হয়নিকো পারস্য, মারাকেশের ভরাডুবির, দেখবো এখন কতোদিন রয় অসুস্থতা তুর্কির!’

তুর্কির অতিত ও বর্তমান

তুর্কির এ রোগ বিষাক্ত থেকে বিষাক্ততর হয়ে গিয়েছিলো। যা ছিলো মুসলিম সমাজের কাটা ঘায়ে লবণ দেওয়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক। কোথাও কোনো আলোর ছিটেফোটাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। নিভুনিভু আশার প্রদীপগুলোও পুরোপুরি যেনো নিভেই যাচ্ছিলো।

কিন্তু আল্লাহর কারিশমা বুঝা বড় দায়। তাঁর কর্মকুশলতার সামনে সব কিছু তুচ্ছ। তিনি মৃতুপ্রায় মুসলিম জাতির অন্তরে চেতনা ও উদ্দীপনার জীবন সঞ্চালন করে দিলেন। তাই আল্লাহর করুণায় তুর্কি জাতি নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তাদের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। উম্মুক্ত হয় নতুন দিগন্ত। ছ্যাঁতছ্যাঁত জখমগুলো একেএকে শুকিয়ে ভরাট হতে থাকে।

মোস্তফা কামাল পাশা ইসলামি নিদর্শনগুলো মিটিয়ে দেয়। আরবি ভাষা ও ইসলামি সংস্কৃতিসমূহে কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। দীর্ঘ কয়েক যুগ ব্যাপী বিভিন্ন অপকৌশল আর ষড়যন্ত্রের দরুণ ইসলামি সভ্যতা যেনো প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়া অবস্থা। কিছু দিন আগে যেখানে আজান, নামাজ নিষিদ্ধ ছিলো, সেখানে এখন নতুন করে শুরু হচ্ছে ইসলামের জয়গান। জনগণ পুনরায় ইসলামি দর্শন ও বিধানাবলী স্বাধীনভাবে পালন করছে। উন্মুক্তভাবে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে গর্ব করছে। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ততায় আনন্দিত হচ্ছে।

ইসলামপন্থীদের সংখ্যা এতোটাই বেড়েছে যে, তাদের ভোটেই ইসলামপন্থী নেতাদের জন্য রাষ্ট্রের উঁচু উঁচু পদে সমাসীন হওয়ার রাস্তা খুলে গিয়েছে৷ আর এভাবেই তুর্কির বিষাক্ত ক্যান্সার ধীরে ধীরে সেরে উঠছে৷ শরীরে নব জীবনের সঞ্চার হচ্ছে দ্রুত গতিতে৷

তুরস্কে 'রাবেতা আদাব'র কনফারেন্স

১৯৯৬ সনের আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইস্তাম্বুলে আমাদের ' রাবেতাতুল আদাবিল ইসলামি' [২]র কনফারেন্স ছিলো৷ তখন সেই ঐতিহাসিক শহরে কনফারেন্সের শুধু অনুমতিই নয়; বরং ইস্তাম্বুলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উদারহস্তে সহায়তাও করেছেন৷ কনফারেন্সের সভাপতি হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম আলি মিয়া নদভি রহ. পৃথকভাবে কর্পোরেশন হলে বক্তব্যও রেখেছেন৷ যেখানে তুরস্কের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও বুদ্ধিজীবীদের ডাকা হয়েছে৷ অত্যন্ত শান- শৌকত আর জাঁকজমকের সাথেই সেই জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো৷

তুর্কির এ পরিবেশ পূর্বের তুলনায় সত্যিই ভিন্ন৷ পুরোনো সেই ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতা এখন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত৷

---

[২] বিশ্ব ইসলামি সাহিত্য সংস্থা৷ ১৯৮৪ সনে হজরত মুফাক্কারে ইসলাম আলি মিয়া নদভি রহ.' র আহ্বানে প্রতিষ্ঠিত হয় এ সংস্থা৷ হিন্দুস্তান, বাঙলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, সৌদিআরবসহ মুসলিমবিশ্বের বড় বড় ইসলামি ব্যক্তিত্ব এ সংস্থার সদস্য হয়ে বিশ্বব্যাপী সাহিত্য ও দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন৷ বর্তমানে এর প্রধান দায়িত্বশীল নদওয়াতুল উলামার লাখনৌর পরিচালক আল্লামা রাবে হাসানি নদভি দা.বা.

যা ইতিপূর্বে তুর্কি সমাজে ভাইরাস বিষফোঁড়ার মতো নির্গত হয়েছিলো।

তুর্কির বসবাস মুসলিম বিশ্বের হৃদয়ের মনিকোঠায়। এই হৃদয়ের মনিকে ইউরোপীয় কালো হাতগুলো যেনো গলা টিপে মেরে ফেলতে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা আঁকে। কিন্তু আল্লাহর কৃপায় এখন তুর্কির বুকে বসন্ত ছোঁয়ায় যেনো বাহারি ফুলের সমারোহ।

নতুন বসন্ত, নতুন সমারোহ

মুসলিম বিশ্বে অধঃপতন আর ধ্বংসের পীড়াদায়ক বিভিন্ন ট্র্যাজেডি গতো দু' শতক ধরে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগটা ছিলো আরো ভয়ঙ্কর ও দুর্বিষহ।

তখন দু' টি কঠিন ঝড় আপতিত হয়। প্রথমত, সমগ্র এশিয়ায় রুশ কম্যুনিস্ট কর্তৃক স্বায়ত্তশাসনের প্রভাব বিস্তার। দ্বিতীয়ত, তুর্কিতে খেলাফাতে উসমানিয়ার পতন ও ধর্মদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া। তখন এশিয়া মহাদেশ, বিশেষকরে তুর্কি ছিলো মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় রাজধানী। শতো শতো বছর ধরে পৃথিবীতে এটাই ছিলো মুসলিমদের শক্তির উৎস। মধ্য এশিয়ায় বুখারা ও সমরকন্দ ছিলো মর্যাদার প্রতীক। সেখান থেকে এসেই শেষ যুগে মোঘল মুসলিমরা উপমহাদেশ শাসন করেছে। যারা ছিলো উপমহাদেশীয় মুসলিমদের জন্য শক্তি- সামর্থ্যের ভরসা। তাই বুখারা, সমরকন্দ, ফারগানা, তাসখন্দ' র মতো মধ্য এশিয়ার এসব রাষ্ট্রগুলো থেকে ইসলামি সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিলো- এর প্রভাব দিল্লি, হায়দারাবাদ, লাহোরসহ উপমহাদেশের অন্যান্য

জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ে। যা উপমহাদেশের মুসলিম সংস্কৃতির রূপ নেয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উপমহাদেশে এ সংস্কৃতিই অবশিষ্ট ছিলো। অবশেষে ইংরেজরা নিজেদের শক্তির জোরে মুসলিম নেতৃত্বকে ছিনিয়ে নেয়। এর ঠিক ৬০ বছর পর ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ সনের মধ্যে সমরকন্দ, বুখারা, তুর্কিস্তান থেকেও ইসলামের প্রভাব অবদমিত করতে থাকে। আর তখনই বৃটেনের সহযোগিতায় মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক খেলাফাতে উসমানিয়া বিলুপ্ত করে। ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে নিশ্চহ্ন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যায়। যার ফলে ইউরোপ থেকে নিয়ে পুরো এশিয়ার চীন পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুসলিম বিদ্বেষী ও খোদাদ্রোহীদের স্বায়ত্তশাসনের কবলে পড়ে যায়। তুর্কিস্তানের অধঃপতনের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সকল আরব রাষ্ট্রগুলোই নিজেদের আশ্রয় ও রক্ষা কবজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে মুসলিম আরব রাষ্ট্রগুলো ইউরোপের রাজনৈতিক চালের টোপে পরিণত হয়। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধ্বংস করে বংশ পূজার মতো জাহিলিয়্যাতের বীজ বপন করে। এবং আরব রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে মিসরি, শামি, জাযায়েরি, সুদানি, ইরাকি, হেজাযি, এভাবে পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের রূপ নেয়।

অন্যদিকে তুর্কিস্তানে নেতৃত্বের জন্য লোকদেরকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠিতে পরিণত করে। পাশাপাশি তুরানি সাম্প্রদায়িকতার বুলি আওড়িয়ে এক হজবরল অবস্থার সৃষ্টি করে। আর এভাবেই খৃস্ট জগতের হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন বাস্তবতার রূপ নেয়। যা মূলত পৃথিবীতে বিস্তৃত মুসলিম জাতির ঐক্যকে

চুরমার করেই তবে সম্ভব হয়েছে। এর প্রভাবেই মুসলিমদের এক বৃহৎ গোষ্ঠির হৃদয় থেকে ইসলামের প্রতি দরদ ও ব্যথা, আবেগ ও ভালোবাসা দূর করে ঘৃণায় ভরে দেয়। বিভিন্ন জাতি ও ভাষাগত পার্থক্য ভুলে যে একতার বন্ধন স্পাত কঠিন দেয়ালের মতো ছিলো, ভেঙ্গে তা নি:শেষ করে দেয়। ইরান, ইরাকের শক্তির যে উৎস ছিলো খেলাফাতে উসমানিয়া, তা ধ্বংস হয়ে যায়। তুরানি ও তাতারি মুসলিমদের হৃদয়ে ইমানি স্পন্ধন মুছে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়। আর তখন থেকেই শুরু হয় গোলামির গন্ধ। মুসলিম দরদি শাসকের পরিবর্তে সেখানে বসানো হয় নিজেদের পুতুল সরকার। যারা তাদের পশ্চিমা মনিবদের ইঙ্গিতেই নেচে বেড়াতো। তুর্কিস্তানের বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় পরস্পর জাতি ও ভাষাগত বিরোধ উসকে দেয়। ইসলামি সভ্যতা ও ঐতিহ্যসমূহকে ধ্বংস করে দেয়। মসজিদে (নাউজু বিল্লাহ) গানবাদ্য বাজাতে শুরু করে! অর্থনৈতিক খাতগুলোতে ইসলামি নির্দেশনার পরিবর্তে নিজস্ব ধ্বাংসাত্বক দর্শন পেশ করে। দ্বীনি ও আরবি শিক্ষার সামান্য প্রচেষ্টাকেও কঠিনহস্তে দমন করা হয়। নামাজসহ ইসলামের সকল ইবাদতে সময় ব্যয় করাকে রাষ্ট্রীয় কাজের প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত করে। ধর্মীয় কাজের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে টীম গঠন করা হয়। যারা নাস্তিকতা আর ধর্মহীনতার প্রতি মানুষকে জোড়গলায় আহ্বান করে বেড়াতো।

এভাবেই কেটে যায় প্রায় সাত যুগ। কী অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই যুগ! কতোই না ভয়ঙ্কর সেই যুগ!! বিষাক্ত এ দীর্ঘ সময়েই পার করে

পরবর্তী তিন প্রজন্ম। যাদের মস্তিষ্ক থেকে ইসলামি চিহ্নগুলোকে প্রায় মিটিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, রুশ কর্তৃক মুসলিমদেরকে জোরপূর্বক ধর্মহীন করার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়, এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম হৃদয়ে নিজেদের অতিত ইতিহাসে ফিরে যাওয়ার রঙীন স্বপ্ন যেনো পেখম মেলতে শুরু করে। আর তাই রুশকর্তৃক আরোপিত শাসন ব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হবার পর রাশিয়ান বিভিন্ন প্রদেশ নিজেদের স্বাধীনতার শ্বাস নিতে শুরু করে। তখন থেকেই মুসলিমগণ নিজেদের অতিতকে স্মরণ করতে থাকে। শুরু হয় নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে নতুনভাবে সম্পর্ক স্থাপনের চেতনা উজ্জীবিত হয়। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন আলেম ও দাঈগণও সেখানে সফর করতে থাকেন। শুরু হয় নতুন এক ইসলামি বসন্ত।

অন্যদিকে তুর্কিস্তানেও ঠিক এমনটিই ঘটে। মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে একজন কমান্ডার হিসেবে নৈপূণ্য ও বাহ্যিক সভ্যতা দেখিয়ে তাকে একক লিডারে পরিণত করা হয়। এরপর তার মাধ্যমে ইসলামি নিদর্শনাবলীকে মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা করে। টুপি পরা ও আরবিতে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করে। আরবি ও ইসলাম শিক্ষায় পাবন্দি আরোপ করে। নারীদের জন্য পর্দাকে অপরাধ সাব্যস্ত করে। পশ্চিমা পোষাকের ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হয়। এসব আইনের বিরুদ্ধে গেলে কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। নাস্তিকদের সকল কাজ সহজ করে দেওয়া হয়। ইসলামপূর্ব মূর্খ যুগের মতো কৃষ্টিকালচার, ভাষা ও সভ্যতা- সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমা দর্শন ছড়িয়ে

দেওয়ার সকল প্রকার প্রচেষ্টা করা হয়। আর তাই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্বভাব ও চালচলনে পুরা তুর্কি ইউরোপের মতো হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্ব থেকে এর সম্পর্কই যেনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি শুধু সংস্কৃতির পেছনে রাষ্ট্রীয় মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার সুবাদে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও তখন আর হয়ে উঠেনি! ফলে দরিদ্রতার কবলে আটকে পড়ে তুরস্ক- তুর্কিস্তান। এভাবেই তুর্কি ইউরোপের অনুগত রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে। পূর্ণ হয় শত্রুদের হৃদয়ের কামবাসনা। মুসলিম বিশ্বের বক্ষে বসিয়ে দেয় ওদের বিষদাঁত!

ষড়যন্ত্র! সফলতার সোপান

এতোসব ষড়যন্ত্রের মাঝেও একটি বিষয় ইতিবাচক হয়ে কাজ করেছে। বুলগেরিয়ায় সমগ্র তুর্কি মুসলিমদের ও জার্মানিতে সংখ্যালঘু তুর্কিদের উপর খৃস্টান সরকারের জুলুম- নির্যাতনের যে স্টীম রোলার চালানো হয়, বসনিয়ায় তুর্কি সাহায্যপ্রাপ্ত মুসলিমদের উপর খুন- হত্যার যে বাজার বসানো হয়, এবং সর্বশেষ চেচনিয়ায় তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলিমদের প্রতি যে অন্যায়- অবিচার করা হয়, এ সকল কারণে তুর্কি মুসলিমদের রক্তে নতুন জোয়ার শুরু হয়। ইসলামের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও সমবেদনা আরো বেড়ে যায়। যার ফলে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে।

অন্যদিকে উচ্চপদস্থ কিছু ব্যক্তিবর্গ তুরস্কে কুরআনে কারিম হিফজের ব্যবস্থা করেন। এবং নামাজের জন্য ইমাম ও মুআজ্জিনের প্রয়োজন মিটাতে বিভিন্ন ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার অনুমোদন দেন। যার দরূণ তুর্কিস্থানে হাজার হাজার শিশু ও

যুবকেরা ইসলাম ও শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। নতুন তুরস্কের নতুন প্রজন্মের সাথে ইসলামের সম্পর্ক যেনো তখন একটু একটু করে গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হতে থাকে। একের পর এক প্রতিষ্ঠা হয় অসংখ্য ইসলামি মিডিয়া। যা পাশ্চাত্য সভ্যতার ষড়যন্ত্র ও ধোঁকার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হয়ে কাজ করতে থাকে।

মোটকথা গতো দু' দশক ধরেই মুসলিম বিশ্বে এক ভিন্ন রূপ দেখা যাচ্ছে। ইউরোপের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞা জন্মাচ্ছে। ইউরোপের খৃস্টান সাম্প্রদায়িকতা ও ঔপনিবেশিক আচরণে মানুষের অসন্তোষ বেড়েই চলছে। যুবকদের হৃদয়ে নিজেদের গর্বিত অতিতের সোনালি ইতিহাস দোলা দিচ্ছে। যুবকদের মুখে আমেরিকান স্বৈরশাসনের বিরোধিতা নজরে পড়ার মত। প্রান্তে প্রান্তে মুসলিম ঐতিহ্যগুলো যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এগুলোই মূলত মুসলিম বিশ্বে যেনো নতুন বিপ্লবের বার্তা দিচ্ছে। পৃথিবীর অবস্থা এক ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পরস্পরে সাহায্য, সৌহার্দ্যের প্রয়োজন অনুভব করছে। সকলের মনে যেনো একটি কথাই থেকে থেকে জেগে উঠছে, আমরা মুসলিম। আমরা এক ও অভিন্ন। আমাদের দুশমন ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে ওরা ঐক্যবদ্ধ। তাই আমাদের সমস্যাও এক ও অভিন্ন। এ মুহূর্তে যে শক্তি আমাদেরকে এক কাতারে শামিল করতে পারে, আমাদেরকে ইজ্জত দিতে পারে, তা হলো ইসলাম। শুধুই ইসলাম।

কিন্তু দু:খের বিষয় হলেও সত্য, মুসলিম বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানগণ এখনো ইউরোপ, আমেরিকার গোলামি থেকে মুক্ত

হতে পারিনি। ইউরোপ নিজেদের খোদাদ্রোহী ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্য তাদের পছন্দমতো শাসকদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মসনদে বসিয়েছে। তাদের কারণেই আজ মুসলিম রাষ্ট্রেও দাঈগণ বহু সঙকট ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিন্তু এ সমস্যাগুলোই যেনো ইউরোপের মোকাবেলায় ইসলামের ছায়াকে বৃদ্ধি করেই চলছে। ইসলামের শীর সমুন্নত রাখতে অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এরই প্রভাবে তুর্কিতে ইসলামপন্থীরা গতো ইলেকশনে এতো বিশাল ভোটে পাশ করেছে, যে ইসলামপ্রিয় লিডার নাজমুদ্দীন আরবেকানের যোগ্য শিষ্যরা আজ সে ভোটের প্রভাবে তুরস্কে ইসলাম প্রিয়তা প্রকাশ্যেই প্রচার করে যাচ্ছে। যেখানে কিছু দিন পূর্বেও উঁচু কণ্ঠে ইসলামের কথা বলাটাই ভয়ঙ্কর ও বিপদজনক ভাবা হতো; আজ সেখানের মসনদ থেকে ইসলামের আওয়াজ ভেসে আসছে!

আল্লাহর শোকর, এখন পূর্বের সেই পীড়া ও যন্ত্রণার অবসান পূর্ণ রূপেই হতে চলছে। নতুন এক জাগরণ শুরু হচ্ছে তুরস্কে- তুর্কিস্তানে। যেনো শীঘ্রই দীর্ঘ কোনো বসন্তের দেখা মিলবে। চারিদিকে ফুটে থাকা ফুলেরা সুগন্ধিতে মাতোয়ারা করে তুলবে। পত্রপল্লবে আর সবুজে- শ্যামলে সবুজারণ্য হবে। পাখিরা গান গাইবে আনন্দচিত্তে.....!

তপ্ত মরু প্রান্তরে বসন্ত কাফেলার ভিড়

মূল

মাওলানা নজরুল হাফিজ নদভি আজহারি

তপ্ত মরু প্রান্তরে বসন্ত কাফেলার ভিড়

গতো কিছু দিন পূর্বে তুরস্কের পার্লামেন্ট নির্বাচনে রজব তায়্যিব এ্যারদোগানের পার্টির যে তুলনাহীন সফলতা মিলেছে, তাতে পুরো পাশ্চাত্যেই অভাবিত পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোতেও যেখানে ৩৫% ভোট হয় না; সেখানে তুরস্কে কীভাবে ৮৮% হয়ে গেলো? এর মাঝে রজব তায়্যিব এ্যারদোগান পেলো সাড়ে ৫২%!

অবিশ্বাস্য এই সফলতা কীভাবে সম্ভব হলো? কীইবা এর রহস্য? আমরা উপমহাদেশিদের জন্য এতে কী উপদেশ নিহিত আছে? কীইবা শিক্ষা রয়েছে? আজ আমাদের দাওয়াতি জামাতগুলোর জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ? তুরস্কে নকশাবন্দি তরিকার শায়কগণ কীভাবে নিজেদের দাওয়াতি কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন? অনুকূল- প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই কীভাবে নিজেদের মাকছাদ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে গিয়েছেন? এসব বিষয়ে শুধু উপমহাদেশকে নিয়েই নয়; বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কেই আজ আমাদের নতুন করে চিন্তা করা উচিত।

নতুন এ শতাব্দীর শুরুতে সর্ব প্রথম তিউনিসিয়ায় এক নতুন ইসলামি বসন্তের সুবাস বইয়েছিলো। তখন তিউনিসিয়ার মুসলিমগণ সেখানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেছিলো। কিন্তু

দূর্ভাগ্য, তাদের প্রচেষ্টা আর সফল হতে পারেনি। এরপর সিরিয়া ও মিসরেও ইখওয়ান ও আলকায়েদা ইসলামের জন্য লড়াই করে গেছে। কিন্তু.....। আর এখন ইসলামের সে ভুবনমোহিনী বসন্তী সুবাস বয়ে চলছে তুরস্কে। তুর্কিস্তানে।

রাবেতা আদাবে ইসলামির কনফারেন্স

আজ থেকে প্রায় ২২ বছর পূর্বে ' স্বপ্নের শহর ইস্তাম্বুলে বসন্তের কাফেলা তাঁবু গেড়েছে' এ শিরোনামে মাসিক উর্দু পত্রিকা ' তামিরে হায়াত' এ অধমের একটি লেখা ছাপা হয়েছিলো। তাতে রাবেতা আদাবে ইসলামির প্রেসিডেন্ট মুফাক্কিরে ইসলাম হজরত মাওলানা আলি মিয়া নদভি রহ.' র এর সম্মানে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিলো। যাতে মুসলিম বিশ্বের বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ শরিক হয়েছিলেন। ডক্টর ইউসুফ কারজাভি, শায়খ মুহাম্মাদ কুতুব ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও উপমহাদেশের অনেক আলেমগণ হজরত মাওলানা রহ.' র জীবন চরিত, দাওয়াত ও ফিকর এবং ইলমি বিভিন্ন কারনামার উপর নিজেদের প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তখন তুরস্কের মসনদে নাজমুদ্দীন আরবেকান সমাসীন ছিলেন। এর ঠিক ২২ বছর পর তাঁরই শিষ্য রজব তায়্যিব এ্যারদোগান নেতৃত্বের লাগাম নিজের হাতে নিলেন। এতোটাই শান- সৌকতের সাথে যে, নির্দিষ্ট সময়ের দেড়- দু' বছর পূর্বেই নিজের প্রেসিডেন্সি ইলেকশনে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল গণতান্ত্রিকভাবে এক মহা বিজয় অর্জন করেছেন। এর ফলে পাশ্চত্য জগতে এক অন্যরকম আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তারা এ বিজয়কে শুধু খৃস্টান জাতিই নয়; পুরা পশ্চিমা জগতের জন্য চিরস্থায়ী আশঙ্কা মনে

করছে৷ বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা সভ্যতা ও রাজনৈতিক বিস্তারে বিরাট বাধা মনে করছে৷ তাই আজকের রজব তায়্যিব এ্যারদোগানকে বিশ্বের বিচক্ষণ রাজনীতিবিধদের একজন গণ্য করা হচ্ছে৷ নিজের রাজনৈতিক দূরদর্শীতা, জ্ঞান- বুদ্ধির ফলে তুর্কির রাজনীতিতে তিনি যেনো এক ভাস্বর দীপাধার হয়ে বিরাজ করছেন৷ ইউরোপ- এশিয়ার ফটক ইস্তাম্বুলে তাঁর এই করায়ত্ব অর্জিত হওয়াটা শত্রুদের জন্য বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে৷

অধম ২২ বছর পূর্বে ইস্তাম্বুলে রাবেতা আদাবে ইসলামির সদস্যগণের সেই প্রগ্রামকে ' বসন্তের কাফেলা তাঁবু গাড়ছে' বলে ব্যক্ত করেছিলাম৷ ২২ বছর পর জনগণের ভোটে এ নির্বাচনকে পুনরায় ' বসন্তের তাঁবু গাড়া' শিরোনামেই উল্লেখ করছি৷

কুস্তুন্তুনিয়া

কুস্তুন্তুনিয়া৷ আজকের ইস্তাম্বুল৷ মুসলিম বিশ্বের স্বপ্নের শহর এটি৷ এমন একটি শহর যে, ইস্তাম্বুল নামটিই মুসলিম হৃদয়ে জোশ ও জযবার ঢেউ তোলে৷ কামনা ও বাসনার স্বপ্নগুলোকে যেনো বাস্তবের রূপ দিতে শেখায়৷ ইস্তাম্বুল মুসলিম উম্মাহর এক ঐতিহাসিক শহর৷ যা হাজার বছরের কষ্ট ও শ্রমের অর্জন৷ মুসলিম উম্মাহর প্রভাব- প্রতিপত্তির প্রতীক৷ যা শুধু সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতেহের বিজয়কীর্তিই নয়, বরং ইসলামি বিজয় ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক মানচিত্রের মহৎ নিদর্শন৷ জীবন্ত ও ঝলমল করা এক অনন্য অধ্যায়৷ এটাই সেই শহর যা শতো শতো বছর মুসলিম বিশ্বের প্রভাব ও দাপটের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত ছিলো৷

যেখানের বাদশাহদের নাম শুনে ইউরোপের গীর্জাসমূহের ঘণ্টা বাজানোও বন্ধ হয়ে যেতো। ঐতিহ্যের এই শহর গতো ৭০ বছর ধরে শত্রুদের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের ছোবলে মুসলিমদের জন্য বিষাক্তের রূপ ধারণ করেছিলো। হাজার হাজার আলেমগণকে শুধু মুসলিম দাঈ হওয়ার কারণেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছিলো। ইসলাম প্রিয় লক্ষ লক্ষ মানুষকে বন্দি করে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো। অবশেষে বহু রক্ত নদী পেরিয়ে যেনো তীরের দেখা মিলছে! আমাদের কাফেলা যখন ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করছিলো, চার দেয়ালের কুরআনি মকতবের শিশুরা আয়াসুফিয়ায় তখন নতুন করে যেনো আজানের সুর ভাসাতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। যেখানে ইসলামের কথা বলার অপরাধে পুলিশরা থানায় রিপোর্ট দিতো, আজ সেখানেই অত্যন্ত গর্ব আর আত্মসম্মানের সাথে সরকারি স্টেজ থেকেই দ্বীনের কথা প্রচার হচ্ছে!

হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ.' র তুর্কি সফর

হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ. ১৯৫৬ সনে প্রথমবারের মতো এই ঐতিহাসিক ভূমিতে প্রবেশ করে বলেছিলেন, হে বাসনার স্বপ্নবাজরা! তোমরা সব মাটির সাথে মিশে গেলে! হে হৃদয়ের ভূমি! প্রতি কদমে যেখানে পিষে ফেলা আকাঙ্খাগুলোর রক্ত নদী বয়ে যাচ্ছে। তছনছ করা এই ভূমির করুণ এই দশাতে যেনো রক্তের অশ্রু টপটপ করে পড়ছে!

কিন্তু দাওয়াত ও আজিমাতের এই রাহবার, জাতির অধঃপতনের এই ধ্বংসাবশেষ ও মৃতপ্রায় দেহের কারণ অন্বেষী, ইতিহাসের

ছিদ্রতে লুকায়িত গুপ্তধন অনুসন্ধানী এই সূক্ষ্মদ্রষ্টা লেখক, এবং চিরস্থায়ী দ্বীনে ইসলামে বিশ্বাসী এই মরদে মুমিনের হৃদয়ে আশার আলো উঁকি দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো-

عطا مومن کو پہر درگاہ حق سے ہونے والا ہے

شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی

আসবে পুনর্বার নেয়ামত হক তাআলার

ভাষা আরাবির, বুদ্ধি হিন্দির, মাহাত্ম্য তুরকুমানির

সফলতার রহস্য, আলি মিয়া নদভি রহ.' র লেখনীর প্রভাব

তুর্কি সরকার প্রথমে হিফজুল কুরআনের জন্য মকতব তৈরি এবং মসজিদের ইমামদের জন্য সীমিত স্কেলে শিক্ষার অনুমতি দিয়েছিলো। তারা ভেবেছিলো, শক্তিধর গণতান্ত্রিক এই ব্যবস্থা পশ্চিমা বিশ্ব এমনকি তুর্কি সেনাবাহিনীতেও প্রভাব বিস্তার করে আছে, সামান্য ইসলামি শিক্ষা তার কীই বা ক্ষতি করবে? কিন্তু কুরআনের এই হাফেজ আর মসজিদের ইমামগণই ধাপে ধাপে শিক্ষার সিঁড়ি বসিয়ে প্রথমে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, এবং এরপর সেখান থেকে হুকুমতের মসনদ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হিফজুল কুরআন, কুরআন শিক্ষা, ইমামতি আর ওয়াজের সীমাবদ্ধ পরিবেশকে তারা গনিমত মনে করেন। মকতবের এই চার দেয়ালে ইসলামি তরবিয়াতেরও ব্যবস্থা করা হয়। ফলে হিফজুল কুরআনের এই নেজামে এতোটাই বরকত হয় যে, এর বদৌলতে শুধু আরবি

ভাষাই নয়, পূর্ণ ইসলামই যেনো জাগতে শুরু করে। ইসলামি সভ্যতার প্রদীপ যেনো ধীরে ধীরে দ্যুতি ছড়াতে থাকে।

এক তুর্কি আলেম বলেন, আপনি তুরস্কের পথেঘাটে নির্লজ্জ ও বেহায়াপনা দেখে নিরাশ হবেন না। আমরা তুর্কি শিশুদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার যে ব্যবস্থা করেছি, এর প্রভাব দশ বছর পর প্রকাশ পাবে ইনশা আল্লাহ। নীতি নির্ধারণ নয়, বরং আমরা তুরস্কের সমাজ ব্যবস্থাকেই নতুনভাবে ঢেলে সাজাচ্ছি। আমরা মুফাক্কিরে ইসলাম হজরত শায়খ নদভি রহ.' র কথার উপর আমল করছি। ১৯৫৬ সালে তিনি তুরস্কের সফরে এসে আমাদের নসিহত করেছিলেন, ' একজন মুসলিম মেয়ে শিশুকে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া মানে পুরো একটি জাতিকে ইসলামের আলোতে আলোকিত করা'। এখন পর্যন্ত এগারো শতো মাদ্রাসা শুধু মেয়েদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। হিফজুল কুরআনের দশ হাজার মকতব এবং ইসলামি হোস্টেলের মাধ্যমে বিশ হাজার নওজোয়ানকে ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে ইসলামি পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সামান্য অর্থায়নে তাদেরকে থাকা-খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। কিতাবের যোগান দেওয়া হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকায় গেলে সেখানেও আমরা তাদের জন্য এ সকল ব্যবস্থার যোগান দিচ্ছি।

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য, ইরাকের প্রসিদ্ধ আলেম ও দাঈ শায়খ মুহাম্মাদ মাহমুদ আস সাওয়াফ যিনি রাবেতা আলামে ইসলামির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, বাদশাহ ফয়সালের সহযোগিতায় আর তুরস্কের কিছু একনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায়

তিনি রাষ্ট্রের প্রান্তে প্রান্তে হিফজুল কুরআনের এক জাল বুনে দিয়েছিলেন। ' মুআসসসা আল হারামাইন' সংস্থার মাধ্যমে নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। নকশাবন্দি শায়েখগণ নিজেদের খানকাহে নীরবে নওজোয়ানদের চারিত্রিক পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা করতে থাকেন।

অন্যদিকে নদওয়াতুল উলামা থেকে ফারেগ হওয়া শায়খ ইউসুফ সালেহ করাচা ভিন্ন এক আন্দোলন শুরু করেছেন। তিনি হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম শায়খ আবুল হাসান আলি নদভি রহ.' র সকল কিতাব তুর্কি ভাষাতে অনুবাদ করেছেন। বিশেষকরে তারিখে দাওয়াত ও আজিমাতের সকল খণ্ডের তুর্কি অনুবাদ হয়ে গেছে। এভাবে সিরাতে সাইয়্যিদ আহমাদ শহিদ, মা যা খাসিরাল আলাম, কিসাসুন নাবিয়্যিনের সকল খণ্ডই তুরস্কে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ.' র কিতাবাদির অনুবাদ অধিকহারে পড়া হচ্ছে। তুর্কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ বিপোর্টে আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে এ বিষয়টা স্বীকার করা হয়েছে যে, তুরস্কে দ্বীনি চেতনা জীবিত করতে এ সকল বই অনেক প্রভাব ফেলেছে।

হজরতের সাথে এরদোগানের সাক্ষাত

১৯৯৬ সনে রাবেতা আদবে ইসলামির প্রোগ্রাম ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তখন রজব তায়্যিব এ্যারদোগান সেখানের মেয়র ছিলেন। ইস্তাম্বুল কর্পোরেশনের পশ্চিম অংশে সমুদ্র তীরে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন একটি হোটেলে রাবেতার সদস্যদের মধ্যাহ্নভোজন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য চলাকালীন রজব তায়্যিব এ্যারদোগান

বসনিয়া সফর থেকে ফিরে ইয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ.কে স্বাগত জানাতে এসে যে কথা বলেন, তাতে এটাও স্বীকার করেন যে, হজরত মাওলানার কিতাবগুলো নতুন প্রজন্মকে প্রভাবান্বিত করছে। এ্যারদোগান নিজের পুত্রের দিকে ইশারা করে বলেন, ' হজরত মাওলানার কিতাব কিসাসুন নাবিয়্যিন পড়ার পর থেকেই হজরতের সাথে সাক্ষাতের জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করছিলো। আজ সে আপনার জিয়ারতে ধন্য হলো। '

এ্যারদোগানের সফলতার নেপথ্যে

রজব তায়্যিব এ্যারদোগানের সফলতার কারণ ও প্রেক্ষাপটসমূহের পেছনে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মতো নয় যে, নাস্তিক, খোদাদ্রোহীদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও নকশাবন্দি শায়খগণ নিজেদের খানকাহি কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছেন। তাদের সাথে মিলে তুরস্কের বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ীগণ অত্যন্ত গোছালো ও পরিকল্পিত রূপে নামিদামি শহরগুলোতে ইসলামি হোস্টেল নির্মাণ করেছেন। যে ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত। এ্যারদোগানের রাজ্য ও প্রাদেশিক সরকার তাদের সাথে মিলেই কাজ করছেন। এর পাশাপাশি হুফফাজুল কুরআন ও মসজিদের ইমাম ও খতিবগণও এতে অংশীদার হয়ে এক সাথে পথ চলছেন। এ্যারদোগানের দল যে শহরের কর্পোরেশন এবং পৌরসভা পর্যায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদের দেখাশোনার জন্য মসজিদের ইমাম ও খতিবগণকে নিযুক্ত করা হয়। যারা তিন মাস অন্তর- অন্তর

দায়িত্বশীলগণের কাজের রিপোর্ট লিখে সরাসরি এ্যারদোগানের কাছে পেশ করেন।

কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এক বছর পূর্বে এ্যারদোগনের কাছে রিপোর্ট যায়, কোনো কোনো এলাকার কর্পোরেশন এবং পৌরসভার দায়িত্বশীলগণ নিজেদের কাজে অবহেলা করছেন। যার কারণে পার্টির বদনাম হচ্ছে। বিরোধি পার্টি তাতে ফায়েদা লুফে নিচ্ছে। এ্যারদোগান তাৎক্ষণিক দায়িত্বশীলদেরকে নিজেদের পদ থেকে এস্তেফা দিতে বলেন। এবং তাদের পরিবর্তে এমন লোকদেরকে মসনদে বসান, যারা জনগণের অভিযোগ দূর করতে তুরন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর এভাবেই সমালোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

সেনা বিদ্রোহ দমনের পর এ্যারদোগান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন। জনগণের সাথে সরাসরি সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাদের সমস্যা ও অভিযোগগুলো শুনে তৎক্ষণাৎ সমাধানের ব্যবস্থা নেন। সেনাবিদ্রোহের সদস্যদেরকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক তো শাস্তি দেন ঠিকই, কিন্তু তাদের পরিবারের জন্য আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। ফলে এক চমৎকার ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এ্যারদোগান যেহেতু মধ্যবিত্ত পরিবারের তাই অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি নিজেই অর্থনৈতিক সেক্টরগুলো দেখাশোনা করেন। এ পদের দক্ষ ও দায়িত্বশীলগণ থেকে কোনো ভুলত্রুটি প্রকাশ পেলে তা নিজেই শুধরে দেন।

এ্যারদোগান এমন এক লিডার যিনি রাজ্যের ব্যবসায়িক থেকে নিয়ে ভ্রমণখাত, অর্থনৈতিক থেকে নিয়ে সাংস্কৃতিক এবং প্রতিরক্ষা থেকে নিয়ে রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষার সকল ক্ষেত্রেই সুগভীর দৃষ্টি রাখেন। রাষ্ট্রে এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ তথা বৈদেশিক মুদ্রা জমা করা, কারেন্সির হ্রাস ও বৃদ্ধি, আদমশুমারিসহ সকল বিষয়ে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিটি পয়েন্টের দায়িত্বশীলদের নানাবিধ জটিলতাও তিনি নিজে দূরীভূত করার ক্ষমতা রাখেন।

এ্যারদোগান সিরিয়াতে সেনা অপারেশনের ঘোষণা দিলে, বিরোধি দলের সকল রাজনীতিবিধগণ বলে বেড়াচ্ছিলেন যে, এ্যারদোগান নিশ্চিত এ যুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়বেন। এখান থেকেই শুরু হবে তাঁর অধঃপতন। কিন্তু তিনি চিন্তা- ভাবনা ছাড়াই এ অপারেশন শুরু করেননি। আমেরিকান সেনাবাহিনীর ওয়ার্নিংয়ের পরোয়া না করে তুর্কি বাহিনী পরিকল্পনার সাথে নিজেদের হামলা জারি রাখে। অবশেষে এ্যারদোগান সিরিয়া সীমান্ত এলাকায় সফলতা অর্জন করে সীমান্তে উপদ্রবকারীদের পদচারণা বন্ধ করে দেন।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনুষ্ঠিত গতো নির্বাচনের ঘোষণার পর আশঙ্কা হচ্ছিলো, সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলো বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এমনটি হয়নি। বরং রাজ্যে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি শান্তি, নিরাপত্তা প্রতির্ষ্ঠিত হয়। যার কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ রেকর্ড করা পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে তুরস্ক অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হয়।

তুরস্ক গতো বছর সাড়ে সাত পার্সেন্টিসে উন্নতি লাভ করে আই এম এফ ব্যাংক ও ক্রেডিট রেটিং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির অনুমানকে ভুল প্রমাণ করেছে। এ সকল অবস্থায় এ্যারদোগান সময়ের পূর্বেই নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এরপর শুধু তুরস্কই নয়, পুরো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই এক অনন্য রেকর্ড তেরি হয়। ৮৮% ভোট হয়। এই ৮৮%' র ভেতরে সাড়ে ৫২% শুধু এ্যারদোগানের পক্ষেই হয়। যা এক ঐতিহাসিক সফলতা। আর তাই এই প্রথমবার তুর্কি জনগণ প্রেসিডেন্সি ও পার্লামেন্টও এ্যারদাগানকে অর্পণ করে।

আর এভাবেই পশ্চিমাদের ৭০ বছরের চেষ্টা- প্রচেষ্টা ধুলোয় মিশে যায়। গতো ২০১৯' র ২৪ জুনে পশ্চিমা মিডিয়াদের একটি টিম তুরস্কের বড়ো বড়ো শহরসহ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে অপপ্রচারের কুটকৌশল পাতার চেষ্টা করছিলো। রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা বিভিন্ন রিপোর্টে কোনো রকম ত্রুটি খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। মার্কিন প্রশাসন সেই নির্বাচনকে ব্যর্থ করতে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তার সর্বপ্রকার সরঞ্জামাদির যোগান দিতে থাকে। মিসরের ফেরউনরা তো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে বসেছিলো। ফক্স নিউজ ডটকম আমেরিকার বৃহত্তম মিডিয়া জায়ান্ট। এটা বিশ্বের সেই ছয়টি মিডিয়ার একটি, যাদের প্রভাবে অন্য সকল মিডিয়া ৯০% প্রভাম্বিত। এ্যারদোগানের বিজয়ে সবচেয়ে বেশি আঘাত পায় এই ফক্স নিউজ। এর সামরিক বিশ্লেষক রালফ পিটারস সেনা অভ্যুত্থানের ব্যর্থতায় নিজেদের বিদ্বেষী ভাব প্রকাশ করে বলেছিলো, ' শুক্রবার রাতে সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার মাধ্যমে

তুর্কির রুখকে ইসলাম থেকে সরানো এবং তুর্কি সমাজকে ধর্মের অন্ধকার থেকে হটানোর শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেলো!'

নির্বাচনের এই সফলতা দেখে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের অবস্থাকে কুরআনের সেই তা' বির দিয়েই ব্যক্ত করা যায়।

فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

আর কাফেররা হয়ে গেলো হতভম্ব। (সুরা বাকারা, আয়াত-২৫৮)

আফসোস, হিন্দুস্তানি রিপোর্টগুলোও পশ্চিমাদের পথই অবলম্বন করলো। কিন্তু এতো কিছুর পরও তারা সফল হতে পারলো না। বলার অপেক্ষা রাখে না, এরাও পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারাই প্রভাবিত।

এখন প্রশ্ন হলো, এ্যারদোগান কি এ বিজয়ের পর আনন্দের ঢেরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকবেন?

এমনটা হবে না আশা করি। কারণ, তাঁর মূল লক্ষ্য আর পদ্ধতি হলো দাওয়াত ও ইসলাম। ইসলামি ইতিহাসের গভীর মুতালাআ করেছেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও দর্শনের প্রচুর জ্ঞান রাখেন। ইসলামি ইতিহাসে তুর্কিস্তানের অবদানও তিনি ভালো করেই জানেন। ইউরোপিয়ানরা মুসলিমদের সাথে বিশেষকরে তুর্কি মুসলমানদের উপর যে বর্বরতা ও নির্যাতন চালিয়েছে, তিনি সেগুলো ভুলে যাননি। তাঁর মন ও মগজ ইউরোপের আধিপত্যের বিরুদ্ধে চিন্তাশীল হয়ে কাজ করবে বলে মনে করি।

কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়

রাসুলে আরাবি সা. কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়ের সে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তা অর্জনে সাইয়্যিদুনা হজরত আবু আইয়্যুব আনসারি রা. থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছিলো। শতো শতো বছর পর মুহাম্মাদ আল ফাতেহ বসফরাসের নেতাদেরকে লোহার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মজবুত দূর্গ কনস্টান্টিনোপলে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেন।

এরপর সেই তুর্কিস্তানে ইউরোপ তাদের বিশ্বস্ত এ্যাজেন্ট কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার দরোজা খুলে দেয়। এর প্রায় এক শতাব্দী পরে এ্যারদোগানের মতো আত্মমর্যাদাশীল নেতা মুহাম্মাদ আল ফাতেহের প্রদর্শিত পথে চলে পুনরায় পাশ্চাত্য দর্শনের লোহাময় জিঞ্জির ভেঙ্গে ফেলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, তাঁর পথের কাঁটা হলো, তাঁরই ধর্মে বিশ্বাসী আরবের ঐ সকল রাষ্ট্রপ্রধানগণ যারা কখনোই চায় না যে, 'দাওলাতে উসমানিয়া' আবার নিজের পেখম মেলুক, কিংবা মুসলিম বিশ্ব আবার একক নেতৃত্বের অধীনে চলে আসুক! কিন্তু হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ. তুরস্কের শেষ সফর থেকে ফিরে আসলে, তাঁর আশার প্রদীপকে তখন আরো জ্বলজ্বল করতে দেখা যায়। তখন থেকেই তিনি তুর্কির হারানো ঐতিহ্য পুনরায় ফিরে পাবার এক শতো পার্সেন্ট বিশ্বাস করছিলেন। তিনি কুরআনের একটি আয়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন।

و ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم

আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। করুণাময়। (সুরা বাকারা, আয়াত- ১৪৩)

অনন্য বৈশিষ্ট্যময় তুর্কি জাতি

তুর্কি জাতি যে গুণগুলোর দরূণ অন্যান্য জাতি থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তা হলো,

এরাই শতো শতো বছর অত্যন্ত আত্মমর্যাদা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করে রেখেছিলো।

শতো শতো বছর তুর্কিরাই হারামাইন শরিফাইনের সেবা করেছিলো। কাবার সাথে যাদের সম্পর্ক ছিলো সুগভীর।

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা, ধর্মীয় আত্মমর্যাদা, আল্লাহ প্রদত্ত দৈহিক শক্তিমত্তা, ঈমানের সম্পদকে যথাযথ কদর করা, মুসলিমদেরকে ভালোবাসা, মানুষের মাঝে নমনীয়তা ও ন্যায়- নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করা, এ সকল গুণই তাদেরকে বিশ্বময় নেতৃত্ব অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। [৩]

কুস্তুন্তুনিয়াই পৃথিবীর একটিমাত্র শহর, যা বিজয়ের স্পষ্ট সুসংবাদ হজরত রাসুলে কারিম সা. নিজের পবিত্র জবানে করেছিলেন। তিনি বলেছেন-

---

[২] বিস্তারিত জানতে পড়ুন - দো হাফতা তুর্কি মেঁ, কারওয়ানে জিন্দেগিঃ ১-৬, শারকে আওসাত কি ডায়রি এবং মাকাতিবে আবুল হাসান, প্রথম খণ্ড।

لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، و لنعم الجيش ذلك الجيش.

নিশ্চয়ই কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় হবে। কতোই না উত্তম হবে এর বাদশাহ! কতোই না উত্তম হবে তাঁর সেনাবাহিনী!! [৪]

[৪] মুসনাদে আহমাদ- ৪/ ৩৩৫, তবারানি- ১২১৬, বুখারি, তারিখে কাবির- ২/৮১, হাকেম হাদিসটিকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন- মুসনাদে হাকেম- ৪/ ৪২২

তুর্কির অতিত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

মূল

মাওলানা সাইয়্যিদ সালমান হুসাইনি নদভি দা.বা.

প্রারম্ভিকা

পৃথিবীতে যতো বড় বড় জাতি রাজত্ব করেছে, ইতিহাসের পাতাগুলো তাদের আলোচনায় ভরপুর। কিন্তু রাসুলে আরাবি সা.' র মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলা বন্ধ করে, মানব জাতিকে যে সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ দ্বীনের পয়গাম দেওয়া হয়, তাতে শুধু ইসলামের ইতিহাস কিংবা দ্বীনি বিষয়াদিই শামিল নয়; বরং মানুষের বৈশ্বিক ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং শক্তি ও মনস্তাত্ত্বিক- মোটকথা সকল প্রকার ইনকেলাবেরই এক দীপ্ত আহ্বান। নবুওয়াতের তেইশ বছরে রাসুলে আরাবি সা. যে ইনকেলাব ছড়িয়ে দিয়েছেন দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের বিশাল ভূমি জাযিরাতুল আরবে। রাসুল সা.' র পরবর্তি বিশ বছরে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর দুই সুপার পাওয়ার রোম ও পারস্যকে ধ্বংস করে দেন। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বুকে সূচনা হয় নতুন এক দিগন্তের।

এটা ছিলো বিশ্ব মানবতার মুক্তির আহ্বান। যাতে বংশপ্রীতি ও রাজতন্ত্রের কোনোই সুযোগ ছিলো না। খেলাফাতে রাশেদার সোনালি যুগ পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছিলো।

এরপর শুরু হয় উমাইয়া যুগ। উমাইয়া শাসকবর্গের গঠনতন্ত্র ছিলো রাজতন্ত্রের মতো। বংশপরম্পরাগত রাজত্বই ছিলো তাদের নীতি। ইসলামি খেলাফতের কর্ণধার হওয়া সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ে বিভিন্ন সাহাবা ও তাবেয়ীদের প্রতি

যুলুম- নির্যাতন করে। একদিকে ঈমানের বুনিয়াদি আকিদা- বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা দিগ্বিদিক বিজয়ের পতাকা উড়াচ্ছিলো। তো অন্যদিকে জাহিলি যুগের ' রাজতন্ত্র' যেনো তাদেরকে ভেতর থেকে ঘুণের মতো এমনই ফোকলা করছিলো যে, একশো বছর পূর্ণ হতে না হতেই তাদের পা হড়কে গেলো।

এরপর আসে আব্বাসিয়া বংশের রাজত্ব। যা আব্বাসি খেলাফাত নামে পরিচিত। এদের শুরুটা হয় এক প্রকার যুদ্ধ দিয়েই। তাই আব্বাসি খেলাফতের প্রথম বাদশাহ ' সাফফাহ' উপাধিতে ভূষিত হয়। বাঙলায় যার অর্থ, ' খুনি' ।

উমাইয়া যুগের মতো তারাও ইসলামি সীমানাকে দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত করছিলেন। আব্বাসীয় যুগেই মুসলিম জ্ঞানের পরিধি গ্রিক ও ইউনান সভ্যতাকেও প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে আব্বাসিয়া যুগ এক সময় গৃহ যুদ্ধের শিকার হয়। ফলে তারা নিজ গোত্রের বিরুদ্ধেই ইরানি, তুর্কিসহ অন্যান্য বহিঃশক্তির সহযোগিতা নেয়।

সে যাই হোক, খেলাফাতে ইসলামিয়ার এ গুরুত্বপূর্ণ যুগটি নানাবিধ ত্রুটি- বিচ্যুতি ও সফলতাসহ প্রায় পাঁচশো বছর অতিক্রম করে। কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণে তাদের রাজত্বকালের মাঝে মাঝেই এমন মনে হতো, যে এই বুঝি তারা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে। এতোটুকু তো নিশ্চিতরূপে বলা যায়, তাদের প্রথম একশো বছরে বড় বড় বিজয় এবং বহু উন্নতি সাধন হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের শক্তি এতোটাই দুর্বল হয়ে পড়ে, হিজরি ৬৫৬ সনে

তাতারিদের আক্রমণ প্রতিহত করার সামান্য সাহসও তাদের অবশিষ্ট ছিলো না। তাতারিরা আব্বাসীয় নেতৃবৃন্দসহ লক্ষ লক্ষ মুসলিমদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এমনকি মুসলিমদের রক্তে দজলা ও ফুরাত নদিতে পানি বহু দিন পর্যন্ত রক্তের স্রোত বয়ে যায়............

প্রথম অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ

(১ম)

হিজরি সপ্তম শতাব্দী মুতাবেক খৃস্টীয় তেরো শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়ার পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ, মধ্য এশিয়ার উরাল- আলতাই পার্বত্য অঞ্চলে ' কায়ি' নামক এক গোত্র ছিলো৷ যারা নিজেদেরকে তুর্কি বংশোদ্ভূত ' ওঘুজ খান' ' র বংশধর দাবি করতো৷ মরুভূমি, পাহাড়- পর্বতে যারা যাযাবরের জীবন- যাপন করতো৷ নিজ এলাকা ছেড়ে চলতে চলতে তারা সেলজুক সাম্রাজ্য[৫]' র বিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দিনের আওতাধীন এলাকায় এসে স্থির হয়৷ এবং এক সময় সুলতানের নেতৃত্বাধীন সেলজুকি বাহিনীতে যোগ দেয়৷ যা তৎকালীন আনাতোলিয়ায় অবস্থিত তুর্কি ও ফরাসি মুসলিম সুন্নিদের রুম সাম্রাজ্য বলে বিবেচিত ছিলো৷ সুলতান

---

[৫] সেলজুক সাম্রাজ্য: সুন্নী মুসলমান সাম্রাজ্য যারা ১০ শতক থেকে ১৪ শতক পর্যন্ত মধ্য এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য শাসন করেছেন। এই মহান সাম্রাজ্যের স্থপতি সুলতান তুঘরিল বেগ। তিনি জাতি হিসেবে অঘুজ তুর্কি ছিলেন। সুলতান মালিক বেগ (শাসন ১০৭২- ১২৯২ খৃ.) এর শাসনকালে এই সাম্রাজ্য অর্ধ- পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এর পরবর্তীতে এই সাম্রাজ্য ভেঙ্গে ছোটো ছোটো আমিরাতে পরিণত হয়। এবং পরবর্তীতে মোঘল সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্য দখল করে নেয়।

আলাউদ্দিন কায়কোবাদ[৬]' র বিরুদ্ধে চেঙ্গিস খান ও মঙ্গলদের এক যুদ্ধে কায়ি গোত্রের সাহসিকতা ও বিরত্বপূর্ণ কর্মের ফলে সুলতান তাদেরকে একটি বড় এলাকা সমর্পণ করেন৷ এবং সুলাইমান শাহ[৭]' র পুত্র ' আরতুগ্রুল' কে এ এলাকার প্রধান দায়িত্বশীল বানিয়ে দেন৷

হিজরি ৭৮৬ মুতাবেক ১২৮৮ খৃস্টাব্দে আরতুগরুলের মৃত্যু হয়৷ তখন নিজ সন্তান উসমান খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন৷ উসমান ন্যায়পরায়নতার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন৷ মোঘলদের আক্রমণে টুকরো টুকরো হওয়া তুর্কি গোত্রদের একত্র করে গঠন করেন নতুন

---

[৬] প্রথম কায়কোবাদ বা সুলতান আলাউদ্দিন কায়কোবাদ বিন কায়কোবাদ (১১৮৮- ১২৩৭) ছিলেন রোমে সেলজুক সুলতান যিনি ১২২০ থেকে ১২৩৭ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেশী বিশেষত মেনগুজেক বেইলিক এবং আইয়ুবীদের ব্যয়ে সুলতানের সীমানা প্রসারিত করেছিলেন এবং কালোন ওরস বন্দর অধিগ্রহণের সাথে ভূমধ্যসাগরে একটি সেলজু উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরে তার সম্মানে আল' ইয়া নামকরণ করা হয়। সুলতান আলাউদ্দীনের সমৃদ্ধ স্থাপত্যীয় উত্তরাধিকার এবং তাঁর রাজত্বকালে উন্নত উজ্জ্বল আদালত সংস্কৃতির জন্য আজও তাঁকে ' কায়কাবাদ দ্য গ্রেট' নামে স্মরণ করা হয়।

[৭] সুলেইমান শাহ ছিলেন অটোমান সামাজ্যের ঐতিহ্য অনুযায়ী কায়া আল্প এর পুত্র এবং আরতুগরুলের পিতা। যা হোক অটোমান সাম্রাজ্যর বংশবৃত্যান্ত হিসেবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে সুলাইমান শাহ' ই আরতুগরুলের পিতা৷ যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে সকলে এ ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। সুলতান উসমানের পূর্বপুরুষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হিসেবে সুলেইমান শাহের কথা অনেকেই উল্লেখ করেননি। পরবর্তীতে অবশ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকই উসমান এবং সুলেইমান শাহের মধ্যে সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। আরতুগরুলের পূর্বে তিনিই ছিলেন কায়ি গোত্রের প্রধান৷ বলা হয়ে থাকে যে, সিরিয়ায় ইউফ্রেটিস নদীতে সুলেমান শাহ পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন। কালত জাবর বা তার কাছাকাছি একটি অটোমান সমাধিস্থলে ঐতিহাসিকভাবে সুলেইমান শাহ সমাহিত হন। সূত্র: উইকিপিডিয়া বাঙলা৷

এক শক্তিশালী বাহিনি। উসমান খান তৎকালীন ইউরোপের বাইজেন্টাইন খৃস্টান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গ ও এলাকা জয় করেন। এবং অন্যদিকে রুম সাম্রাজ্যের বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর ' বুরসা' করায়ত্বে নেন। প্রতিষ্ঠা করেন নতুন ইসলামি সাম্রাজ্য। যা আজ উসমানি খেলাফত নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। হিজরি ৮২৬ মুতাবেক ১৩২৬ খৃস্টাব্দে সুলতান উসমান খানের ইন্তেকাল হয়।

এরপর ধারাবাহিকভাবে সুলতান ওরহান খান (রাজত্বকাল ১৩২৬– ১৩৬২ খৃ.), প্রথম মুরাদ (রাজত্বকাল ১৩৬২– ১৩৮৯ খৃ.), প্রথম বায়জিদ ইয়ালদিরম[৮], প্রথম মুহাম্মাদ (রাজত্বকাল ১৪১৩– ১৪২১ খৃস্টাব্দ), দ্বিতীয় মুরাদ (রাজত্বকাল ১৪২১– আগস্ট ১৪৪৪ খৃস্টাব্দ), মুহাম্মাদ ছানি আল ফাতেহ (রাজত্ব ৮৫৫- ৮৮৬ হি./১৪৫১- ১৪৮১ ই.)' র মতো উসমান খানের যোগ্য উত্তরসূরিগণ দীর্ঘ সময় শাসনকার্য চালিয়ে যান। আর এটাই মূলত উসমানি সাম্রাজ্য বা উসমানি খেলাফাত বলে পরিচিতি লাভ করে। তাদের এ ইসলামি খেলাফত ব্যবস্থা নিজস্ব উন্নতি ও অগ্রগতিসহ দীর্ঘ ছয়শো বছর অত্যন্ত দাপটের সাথে বিশ্ব রাজত্ব করে। ইউরোপের হৃদপিণ্ড কনস্টান্টিনোপল জয় করে দক্ষিণ- পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড়ান।

---

[৮] রাজত্বকাল ১৩৮৯– ১৪০৩ খৃ., তুর্কি ভাষায় ইয়ালদিরম অর্থ হলো, বজ্রপাত বা বজ্রকঠিন। প্রথম বায়জিদকে তাঁর প্রচণ্ড সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও বিরত্বের কারণে এই উপাধি দেওয়া হয়। সূত্র: উইকিপিডিয়া বাঙলা

(২য়)

আব্বাসিয়া যুগে ক্রুসেডারদের সাথে একের পর এক যুদ্ধ লেগেই থাকতো। তাদের যুগেই ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নেয়। পরবর্তিতে সালাহুদ্দিন আউয়ুবি পুনরাদ্ধার করেন। কিন্তু অন্যদিকে উসমানি খলিফাগণ বিশেষ করে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কুস্তুন্তুনিয়া জয় করে যেনো কুসেডারদের মূল দুর্গই অর্জন করেন। ফলে তৎকালীন ইউরোপ এবং পরবর্তিতে উনিশ শতাব্দির ক্রুসেডাররা প্রথমে উসমানি সাম্রাজ্যকেই নিজেদের প্রধান টার্গেট বানায়। তাই তো পনেরো শতাব্দীতে উন্দুলুসবাসী থেকে তারা যে প্রতিশোধ নেয়, তাতে যেনো উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব শত্রুতার অঙ্গারই লেলিহান শিখার রূপ নেয়। এরই জের ধরে ষোলোশো শতাব্দীতে যুদ্ধবাজ স্পেনিস, পর্তুগীজের পর জার্মানি, ফ্রান্সিস ও ব্রিটিশ ক্রুসেডাররা মুসলিম বিশ্বকে পরাজিত করা এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে মুসলিম নাম মুছে দেওয়ার অপচেষ্টা চালায়। ক্রুসেডাররা সব জায়গাতেই উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। এবং হামলার এক নীল নকশা আঁকে।

সতেরো শতাব্দীতে উপমহাদেশে তাদের ষড়যন্ত্রের নতুন ছক শুরু হয়। অবশেষে ১৮৫৭ সনে ইসলামি মূল্যবোধকে চূর্ণ- বিচূর্ণ করে এখানে ক্রুসেডাররা নিজের পতাকা গাড়ে। এ সময়েও তারা

উসমানি খেলাফাতের বিরুদ্ধে অপতৎপরতার জাল বুনতে এবং তাদের শক্তিকে চুরমার করতে কোনো কমতি করেনি।

(৩য়)

হিজরি ৯১৫ সনে শাহ ইসমাইল সাফাভি ইরানে শিয়া মতবাদ কায়েম করে, সুন্নি প্রজাদের উপর বিভিন্ন নির্যাতন শুরু করে। ফলে সুলতান প্রথম সেলিম খান ৯২০ হিজরিতে তাকে পরাজিত করে তিবরিজ করায়ত্তে নিয়ে নেন। তখন সিরিয়া ও মিসরে

মামলুক শাসকগণ[৯] পরস্পর কোন্দলের কারণে গৃহ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো৷ তাই সুলতান সেলিম ৯২২ হিজরিতে হলব দখল করে

---

[৯] মামলুক সালতানাত ১২০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ার তুর্কি সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক মামলুকদের উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন। দিল্লি সালতানাত শাসনকারী পাঁচটি রাজবংশের মধ্যে মামলুক রাজবংশ প্রথম। এর শাসনকাল ছিলো ১২০৬ থেকে ১২৯০ সাল পর্যন্ত। ঘুরি রাজবংশের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে কুতুবুদ্দিন আইবেক ১১৯২ থেকে ১২০৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এসময় তিনি গাঙ্গেয় অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং নতুন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

মামলুক দ্বারা অধিকৃত বোঝানো হয়। মামলুকরা ছিল ইসলাম গ্রহণকারী দাস বংশোদ্ভূত সৈনিক। ৯ম শতাব্দী থেকে এই ধারা শুরু হয়ে মামলুকরা ধীরে ধীরে শক্তিশালী সামরিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বিশেষত মিশর এবং এর পাশাপাশি লেভান্ট, ইরাক ও ভারতে মামলুকরা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিলো।

১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরি নিহত হন। তার কোনো সন্তান না থাকায় তাঁর সাম্রাজ্য বিভিন্ন সালতানাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার প্রাক্তন মামলুক সেনাপতিরা এসব সালতানাতের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাজউদ্দিন ইলদিজ, ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি, নাসিরউদ্দিন কাবাচা ও কুতুবউদ্দিন আইবেক যথাক্রমে গজনি, বাংলা, মুলতান ও দিল্লির শাসক হন। এর মাধ্যমে মামলুকদের শাসন শুরু হয়।

তাঁর উচ্চপদস্থ মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ নিহত হওয়ার পর আইবেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। আইবেকের শাসন স্বল্পস্থায়ী ছিলো। ১২১০ সালে তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে আরাম শাহ ক্ষমতা লাভ করেন। ১২১১ সালে তিনি ইলতুতমিশের হাতে নিহত হন।

ইলতুতমিশ তাঁর সালতানাতের সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের ঘনিষ্ঠ কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি মোঘলদের উপদ্রবের সময় চেঙ্গিস খান ও তার বংশধরদের আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে সফল হয়েছিলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন চাগতাই খানাত ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহীদের থেকে সালতানাতকে সুরক্ষিত করতে সফল হন৷ পরবর্তিতে গৃহযুদ্ধের ফলে জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ খিলজি কর্তৃক সর্বশেষ মামলুক শাসক ও বলবনের নাতি মুইজউদিন কায়কোবাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে ভারতবর্ষে খিলজি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সূত্র: উইকিপিডিয়া বাঙলা

নেন। এরপর ধীরে ধীরে সিরিয়াই তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। সে বছরেই সুলতানের সেনাবাহিনী মিসর জয় করে নেয়। মিসর ও সিরিয়ার পর হেজাযও তাঁর রাজর্ভুক্ত হয়। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে মামলুক বংশের শাসন। সুলতান সেলিমই প্রথম সুলতান, যিনি ' খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন' উপাধি ধারণ করেন। তিনি ৯২২ সনে মিসর জয় করার পর ঘোষণা দেন, ইহুদিদের জন্য সিনাই উপাত্যকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সুলতান সেলিমের পর তাঁরই সুযোগ্য সন্তান প্রথম সুলায়মান কানুনি ৯২৬ হি. মুতাবেক ১৫২০ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও দাপটের সাথে ৪৬ বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন উসমানি সাম্রাজ্যের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদি খলিফা। তাঁর যুগেই তুর্কি উলামাদের সাহায্যে রাষ্ট্রে সম্পূর্ণরূপে ইসলামি শরিয়াত বাস্তবায়ন করা হয়। এই জন্যই তাঁকে ' কানুনি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি স্থল, সমুদ্র, যুদ্ধের সকল পথেই ক্রুসেডার এবং ইহুদিদেরকে মাথা নত করতে বাধ্য করেন। এমনকি খৃস্টীয় ১৫২৯ সনে উসমানি সাম্রাজ্যের সীমানা পাশ্চাত্যের ভিয়েনা পর্যন্তও পৌঁছে যায়। এবং ১৫২১ সনে ইউরোপের অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির বিভিন্ন এলাকা বিজয় করেন! বলকান রাজ্যও তাঁর অধীনে চলে আসে!!

ষড়যন্ত্র ও বিপর্যয় শুরু

(১ম)

ক্রুসেডারদের অপচেষ্টা

এ ছিলো উসমানি সাম্রাজ্যের স্বর্ণ যুগ। 'সুলায়মান দ্যা ম্যাগ্নিফিসেন্ট' বা মহান সুলাইমানের পর দ্বিতীয় সেলিমের যুগেও বহু বিজয় অর্জন হয়। কিন্তু পরবর্তিতে তৃতীয় মুরাদের যুগ ১৫৭৪-১৫৯৪ খৃ. থেকে তুর্কিদের বিপর্যয় শুরু হয়। বাগদাদ ছুটে যায়; যদিও ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় করায়ত্ত হয়। এবং ইরানিদের সাথে সন্ধি চুক্তি হয়। সুলতান ইবরাহিম (মৃত্যু- ১৬৪৮ ঈ.) 'র যুগে রাশিয়ার সাথে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। চতুর্থ মুহাম্মাদের[১০] যুগে আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া উসমানিদের হাত থেকে ফসকে যায়। এরপর তৃতীয় আহমাদ (মৃত্যু- ১৭৩০ খৃ.) 'র যুগে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শুরু হয়। তবে সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ (মৃত্যু- ১৮৭১ খৃ.) 'র যুগে রাশিয়ানরা মারাত্মকভাবে পরাস্ত হয়। এরপর সুলতান তৃতীয় সেলিম (মৃত্যু- ১৮৭৪ ঈ.) 'র যুগ ছিলো ফেৎনা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতায় ভরপুর। তাঁর যুগে সোভিয়েতদের সাথে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ (মৃত্যু- ১৮৩৯ ঈ.) 'র যুগে হেজাযে ওহাবিরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমাতে তুর্কি খলিফা মিসরের

---

[১০] রাজত্বকাল ১৬৪৮- ১৬৮৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৯- ৪০ বছর। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মেয়াদি উসমানি শাসক। ১৬৯৩ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

শাসক মুহাম্মাদ আলি পাশাকে সহযোগিতা করেন। তিনি হেজাযের করায়ত্ত ফিরিয়ে আনেন। এবং বিদ্রোহী নেতাদেরকে তৎকালীন ইবরাহিম পাশার হাওয়ালা করেন।

সুলতান আব্দুল মজিদ খান রহ. [১১]★(মৃত্যু- ১৮৬১ ঈ.) 'র সময়ে রাশিয়া ও ব্রিটেন মিলে উসমানি সাম্রাজ্যকে ভাগ- বণ্টন

---

[১১]★ **আমীরুল মুমিনিন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ রহ.**

উসমানীয় সাম্রাজ্যের সর্বশেষ প্রকৃত ক্ষমতাধর সুলতান এবং মুসলিম বিশ্বের খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ রহ.। জন্ম- ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২ তোপকাপি প্রাসাদে, মৃত্যু ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্তাম্বুল শহরে। তিনি ছিলেন উসমানীয় সাম্রাজ্যের ৩৪তম সুলতান। সুলতান আব্দুল হামিদ ছিলেন উম্মাহ দরদি মুসলিম বিশ্বের খলিফা যাকে ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাস হস্তান্তরের জন্য ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি মুসলিম বিশ্বের একচুল মাটি ছাড়তেও রাজি হননি।

সুলতান আব্দুল হামিদের পরে আর কোনো শক্তিশালী উসমানি সুলতান মসনদে বসেনি। সুলতানের অপসারণের পরেই তুর্কি খেলাফত ধ্বংসের পথে হাঁটে।

তিনি ছিলেন সুলতান প্রথম আবদুল মজিদের ত্রিশজন সন্তানের মধ্যে পঞ্চম। তিনি ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৬ - ২৭ এপ্রিল ১৯০৯ মোট ৩৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর যুগে উসমানি সাম্রাজ্যের নতুন করে শক্তি সঞ্চার হয়। রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় তাঁকে ইউরোপের বড় রাজনীতিবিধরাও ভয় পেতো। কিন্তু স্বজাতির গাদ্দারিতে তিনিও নেতৃত্ব ছাড়া হন।

কেউ একজন বলেছিলেন এবং সত্যই বলেছিলেন যে, "যখন দেখবে শত্রুরা তোমার কোন কর্মের প্রশংসা করছে, হোক না তা মন্দ, বুঝবে তোমার কাজে তাদের কোন স্বার্থরক্ষা হয়েছে। আর যখন তোমার কোন ভাল কাজেরও নিন্দা করবে, বুঝবে এতে তাদের কোন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।" সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে শত্রুদের আপবাদ ও মিথ্যাচারের যে তাণ্ডব, তা থেকেই বুঝতে পারি, তার পদক্ষেপগুলোর ফলাফলের ব্যাপারে 'আপনজনেরা'না বুঝলেও শত্রুরা পূর্ণই সচেতন ছিল। প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী আর্লন্ড টয়েনবি লিখেন, "সুলতান আব্দুল হামিদের ইসলামি রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মুসলমানদের এক পতাকার নিচে একত্রিত করা। নিঃসন্দেহে যা ছিল মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের ঐপনিবেশিক শক্তিগুলোর আগ্রাসনের এক পাল্টা শক্তিশালী প্রতিরোধী পদক্ষেপ।" তাঁকে নিয়ে ইউরোপিয়রা এত বেশী পরিমাণে লিখেছে যে, সমকালীন ইতিহাসে তো বটেই, সুদীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে অন্য কোন মুসলিম শাসককে নিয়ে তারা ততটা লেখেনি। যার গুটিকয়েকটি ছাড়া সবগুলোই অপবাদ মিথ্যাচার ও প্রপাগাণ্ডায় পূর্ণ।

শৈশব ও শিক্ষাদীক্ষা

দশ বছর বয়সে মাকে হারালে তিনি সৎ মায়ের কাছে লালিত পালিত হন। সৎ মা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্নেহ মমতায় তাকে লালন পালন করেন। সৎ মাতার ধর্মীয় জীবনাচার ও

ব্যক্তিত্বপূর্ণ অবস্থান তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। খলিফা হওয়ার পর তিনি তাঁকে রাজমাতা ঘোষণা করেন। ছোট থেকেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও স্পর্শকাতর প্রকৃতির বলে পরিচিত ছিলেন। রাজপ্রাসাদেই একদল অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর হাতে তার শিক্ষাদীক্ষা চলতে থাকে। তাদের নিকট তিনি আরবি ফারসি ও ইতিহাসের পাঠগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন। এসময় তিনি অশ্বারোহণ, তলোয়ার চালনা ও অন্যান্য অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন করেন।

তিনি কথা অনেক কম বলতেন। কিন্তু অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও চারপাশ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। শৈশব থেকেই নিয়মিত পত্রিকা ও বিশ্বরাজনীতির খবরাখবর রাখা তার অভ্যাস ছিল। তিনি বিশ্ব রাজনীতিতে খেলাফতে উসমানিয়ার অবস্থান বুঝার চেষ্টা করতেন।

শৈশব থেকেই আরেকটি বৈশিষ্ট্য তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে রেখেছিল। তা হলো তার সুপরিমিত অর্থনৈতিক বোধ। তিনি অপচয় একদম পছন্দ করতেন না। সে সময়ে তিনি ছিলেন খেলাফতে ওসমানিয়ার সবচেয়ে ধনী যুবরাজ। তার এই অর্থব্যবস্থাপনাগুণ খেলাফতে ওসমানিয়ার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছিল। খলিফা হওয়ার পর নিজ অর্থব্যয়ে পুরো সাম্রাজ্যে টেলিগ্রাফলাইন স্থাপন করেন।

তাঁর শাসনামলের বৈশিষ্ট্য

খলিফা আব্দুল হামিদ তার শাসনামলের শুরুতে ইউরোপিয় চিন্তাধারার নব্য তুর্কি পাশাদের প্রচণ্ড রকম স্বেচ্ছাচারিতার সম্মুখীন হন। পাশাদের স্পর্ধা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। তিনি মসনদে বসার পর মিদহাত পাশা তাঁকে লিখে, "সংবিধান ঘোষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতার গোড়া কেটে দেওয়া। এবং মহামান্য খলিফার দায়িত্ব ও অধিকারের সীমারেখা বুঝিয়ে দেয়া। পাশাপাশি অন্যান্য উজিরদের দায়িত্ব ও সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করা। .. আমি মহামান্যের আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর যদি না তা জাতির স্বার্থবিরোধী হয়..।" সুলতান তাঁর ব্যাপারে লিখেন, "মিদহাত পাশার অবস্থা ছিল এমন যে সে আমাকে নির্দেশ দিত। যেন সে আমার উপর কতৃত্বশীল। আচার- আচরণে সে ছিল স্বেচ্ছাচারীই।" শুরু থেকেই তিনি পরিস্থিতির জটিলতা সম্মন্ধে সচেতন ছিলেন। তারপরও উপযুক্ত সময়ের প্রত্যাশায় কুচক্রীদের শর্ত মেনেই তিনি ক্ষমতায় আসেন। এদিকে অটোমানদের দুর্বলতার সুযোগে থাবা দেয় রাশিয়ান শ্বেত ভল্লুক। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে তারা ওঁত পেতে ছিল। ১৮৭৭ সালের রুশো - অটোমান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের কারণ দেখিয়ে সুলতান বুনিয়াদি সংবিধান মুলতবি ঘোষণা করেন এবং নির্বাহী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। যুদ্ধে গাজী ওসমান পাশা প্লেভনায় ঐতিহাসিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু খাদ্য আর অস্ত্রাভাবে শেষে পরাজয় হয়।

সুলতান বুঝতে পারেন তার সাম্রাজ্য সামরিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে। তিনি সংস্কার শুরু করেন। দ্রুত সেনা চলাচল ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যাপকভাবে রেল - লাইন নির্মাণ শুরু করেন। অবশেষে ১৮৯৭ সালে অটোমানরা গ্রিসের সাথে যুদ্ধে বিজয় লাভ করে।

তার মসনদে বসার সময় খিলাফত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণের ভারে জর্জরিত ছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৩ বছরের শাসনামলে ঋণ

প্রায় পরিশোধের পর্যায়ে নিয়ে আসেন। তাঁর সময়ে খিলাফত উল্লেখযোগ্য কোন বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেনি। তার ক্ষমতার কালটি ছিল খিলাফতের জন্য চরম ষড়যন্ত্রের। একদিকে তুর্কি জাতিয়তাবাদী আন্দোলন। যা প্রায় শত বৎসর কাল যাবত খিলাফতেকে প্রাণশূণ্য করে ফেলছিল।

(উল্লেখ্য: এই চিন্তাধারার প্রথম উদগাতা ও পরবর্তীতে লালন ও বিস্তারকারীরা ছিল প্রধানত ইহুদি। তাদের মধ্যে থিওডোর হের্জল অন্যতম। যিনি হলেন ইজরাইল জাতির জনক। পরবর্তীতে আধুনিক তুর্কি যুবকরা ব্যাপকভাবে সুলতানের বিরুদ্ধে পত্রিকায় প্রকাশিত মিথ্যা অপবাদে বিদ্রোহী চিন্তাধারায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে।)

অপরদিকে খিলাফতের ইউরোপিয় অংশের খৃস্টানদেরকে পশ্চিমারা সবসময় উস্কানি দিয়েই চলছিল। তৃতীয় বিপদটা ছিল বিশ্ব ইহুদিবাদীদের পক্ষ থেকে। তারা যে কোন মূল্যে ফিলিস্তিনে তাদের জাতীয় ভূমি স্থাপনে মরিয়া ছিল। সেক্ষেত্রে সুলতান আব্দুল হামিদই ছিলেন তাদের প্রধান বাধা। ইহুদিরা ফিলিস্তিনে তাদের জাতীয় নিবাস স্থাপনের শর্তে খিলাফতের সকল ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সুলতান তা অত্যন্ত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। এমন চতুর্মুখী চক্রান্ত নির্মূল করার জন্য তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। বিদ্রোহীরা তখন পালিয়ে গিয়ে ইউরোপে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। খলিফা বুঝতে পেরেছিলেন ইউরোপিয় শক্তিবর্গ খিলাফতকে যত দূর্বল করতে পারবে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে তাদের ঔপনিবেশ ক্ষমতা স্থাপনের পথ ততই সুগম হবে। তাই তিনি প্যান ইসলামিজম বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও প্রায় চল্লিশ হাজার সুফী সাহেবকে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য চেতনা জাগ্রত করানোর বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাজনৈতিকভাবে না হলেও যাতে অভিন্ন চেতনায় পুরা মুসলিম বিশ্বের একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়। উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জিহাদকারীদেরকেও এই অভিন্ন চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি হেজাজ রেল প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার সমুদয় অর্থ মুসলমানদের চাঁদা ও হেজাজ ডাকটিকেট বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। প্রখ্যাত লেখক ও দামেশক বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাঈদ আফগানি (রহ.) বলেন: "আল্লাহ সুলতান আব্দুল হামিদের উপর রহম করুন। তাঁর সমস্তরের উজির ও সাহায্যকারী তিনি পাননি। তার যুগ গত হয়ে গেছে। অসাধারণ যোগ্যতা ও বিপুল কর্মশক্তি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও সুগভীর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার বদৌলতে প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিন দশক কাল তিনি খেলাফতের পতন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। যদি একদল যোগ্য সঙ্গী ও উপযুক্ত সাহায্যকারী পেতেন, তবে খেলাফতকে আবার প্রথম যুগের প্রতাপ ও শক্তিময় অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন।"

ক্ষমতা থেকে অপসারণ ও নির্বাসন

এদিকে দিনদিন নব্য তুর্কিদের আন্দোলন চরমে উঠতে থাকে। সুলতান আব্দুল হামিদ সবসময় এই আন্দোলনের গতি রোধে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তারা দিনদিন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। অপরদিকে ১৯০৬ সালে আনোয়ার পাশার নেতৃত্বে স্যালোনিকায় কমিটি আব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস বা ঐক্য ও উন্নয়ন সংঘ গঠন হয়। তার প্রধান সহযোগী ছিলেন স্বয়ং পাশাদের মধ্যে তালাত পাশা ও জামাল পাশা। নব্য তুর্কিরা এই কমিটির সঙ্গে মিলে কাজ করতে থাকে। ভিতরে ভিতরে সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশকেও তারা নিজেদের

করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইসলামি খেলাফাতকে সহ্য করতে না পেরে উসমানি সাম্রাজ্যকে ক্রুসেড জাতিরা রোগজীবাণু বলে আখ্যা দিয়ে নিজেদের পশুত্বসূলভ রুচির বহিঃপ্রকাশ করে।

১৮৫৮ সনে জেদ্দায় অবস্থিত ফরাসি দূতাবাসে অজ্ঞাত কেউ হামলা করে। প্রতিবাদে ফরাসিরা জেদ্দায় আক্রমণ করে বসে। তখন এর মোকাবেলা করেন তুর্কি খেলাফত কর্তৃক স্বীকৃত মিশরের স্বাধীন খেদিভ সুলতান ইসমাইল পাশার নৌবাহিনী ব্র্যাঞ্চ। পরবর্তিতে ইউরোপের প্ররোচনায় সমগ্র আরব উসমানিদের

পক্ষে আনতে সক্ষম হয়। ১৯০৮ সালে বিভিন্ন শহরে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনসহ তাদের বিভিন্ন দাবির পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে। সেনাবাহিনীতে তাদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশকারী অংশ রাজধানীর উদ্দেশ্যে মার্চ শুরু করে। বাধ্য হয়ে সুলতান তাদের দাবি মত সংবিধান ঘোষণা করেন। শুরু হয় নব্য তুর্কিদের শাসন। কিন্তু তখনও তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে খিলাফতের প্রধান ছিলেন। তাঁর এই অবস্থানটাই ফিলিস্তিনে ইহুদি পূণর্বাসনের জন্য বড় বাধা ছিল। এদিকে নব্য তুর্কিদের শাসনে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। জনমনে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। এটাকে কাজে লাগিয়ে ৩১শে এপ্রিল ১৯০৯ সালে ইহুদি লবি রাজধানিতে এক সুলতানের পক্ষে এক প্রতিবিপ্লব ঘটায়। যাতে নব্য তুর্কিদের কয়েক নেতাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়। তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে এ সকল কিছুর জন্য সুলতানকে দায়ী করে তাকে অপসারণ করা হয়। সেই রাতেই তাঁকে স্যালোনিকায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখানে তাকে এক ইহুদির বাড়িতে কড়া নজরবন্দির মধ্যে রাখা হয়। এরপর তাকে ইস্তাম্বুলে এনে বায়লারবি প্রাসাদে রাখা হয়। এখানেই এই মহান খলিফা ২৮ রবিউল আউয়াল ১৩৩৬ মোতাবেক ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ সালে ৭৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

(বিস্তারিত জানতে পড়ুন: উইকিপিডিয়া বাঙলা, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা- ১৯২১, ইসলামি বিশ্বকোষ, (বাংলা) ১/৭৫০-৭৫১, ইয়ালমায উসতুনা কৃত তারিখুল দাওলাতিল উসমানিয়্যা- ২/৯৯-১৬০, ড. ইসমাঈল আহমদ ইয়াগি কৃত আদ দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিয়্যিল হাদিস- ২১০-২১১, ড. মুহাম্মদ হরব কৃত সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ- ২৮-৪৯, ড. মুহাম্মদ আলি সাল্লাবি কৃত খেলাফতে ওসমানিয়ার ইতিহাস, ৩৯৯-৪৭৮, এ.এম. নাজির আহমদ কৃত ওসমানি খলিফাদের ইতিকথা- ৫০-৫৫, তুরস্কে তুর্কিস্তানের সন্ধানের ভূমিকা- পৃ: ৫)

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সুলতান আব্দুল আজিজ (মৃত্যু- ১৮৭৬ ইং)' র সময়ে বলকানি রাজ্যসমূহেও বিদ্রোহের দানা বেঁধে যায়।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ (রাজত্বকাল ১৮৭৬- ১৯০৯ ইং)' র যুগ নানাবিধ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। ১৮৭৭ সনে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ বাঁধে। রাশিয়া ও ব্রিটেন গোপনে আঁতাত করে। ১৮৭৮ সনে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে ইউরোপিয়ান শক্তিধরদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং আর্মেনিয়া বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৯৭ সালে গ্রিস যুদ্ধের আগুন লাগে। অবশেষে ১৮৯৫ পর্যন্ত পরিস্থিতি যেনো এক কঠিন হত্যাযজ্ঞে রুপান্তরিত হয়। ১৮৮১তে ফরাসিরা তিউনিসিয়ার উপর আক্রমণ করে বসে। ১৮৮৪ সালে ইংরেজরা মিসর জব্দ করে নেয়।

পরিস্থিতি এতোটাই ঘোলাটে ছিলো যে, সমগ্র ইহুদি- খৃস্টানরা মিলে ১৮৯১তে ষড়যন্ত্রমূলক ' ঐক্য ও উন্নয়ন সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করে। এবং ১৯০৯ সনে সুলতানকে অপসরণের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে তাকে গ্রেফতার করে ' সালোনিকা' এলাকায় রওনা করা হয়। যেখানে তিনি ১৯১৮ সাল পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু অবধি কারাগারে বন্দি থাকেন। এদিকে ১৯১২ সনে বলকান যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সালতানাতে উসমানিয়া ধারাবাহিক পরাজয় বরণ করতে থাকে। তুরস্ক তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং এরপর জার্মানির পরাজয়ের সাথে সাথে তুর্কিস্থানও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এটা ছিলো এমন এক মুহূর্ত, যখন ক্রুসেডার ও ইহুদিদের এজেন্ডরা তুর্কিস্থান থেকে ইসলাম মিটিয়ে দেওয়ার পূর্ণ চেষ্টা নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ এ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বিরত্বের সাথে দীর্ঘ ৩৩ বছর রাজত্ব করেন। তিনিই শেষ উসমানি খলিফা যিনি মুসলিম ভূমি ও ঐশ্বর্য ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু স্বজাতিই তাঁকে ধোঁকা দেয়। ফলে তিনি অপসারিত হন। সুলতানের কাছে ইহুদি নেতা হরসেল ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাদির প্রস্তাব পেশ করে। বিনিময়ে ইহুদিদের পক্ষ থেকে বড় অংকের অর্থের অফারও দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামের মাধুর্যতায় দ্রবীভূত সুলতান আব্দুল হামিদ রহ. এ প্রস্তাব অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুড়ে মারেন।

(২য়)

ইহুদি ষড়যন্ত্র

এ ছিলো উনিশতম শতাব্দীর শেষ সময়। এরপর ক্রুসেডার ও ইহুদিরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। ইসলামকে মুসলিমদের মাধ্যমেই ধ্বংস করতে চায়। তাই তুর্কিদের মধ্য থেকেই মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে চয়ন করে। আতাতুর্ক ছিলো কঠোর স্বভাবি, ষড়যন্ত্রে পারদর্শী ও দুশ্চরিত্রবান এক নাস্তিক। দু' মুখী কট্টর মুনাফেকদের সর্দার। বাহ্যত যারা ছিলো মুসলমান; কিন্তু পর্দার আড়ালে ইহুদিদের পা চাটা গোলাম। এরাই মূলত গোপন বৈঠকে ' ঐক্য ও উন্নয়ন সংস্থা' নামের প্রতারণামূলক এক ইহুদি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এদের লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ছিলো,

উসমানি সাম্রাজ্য ধ্বংস করা, ইসলামি মূল্যবোধ মুছে দিয়ে পশ্চিমা কৃষ্টি- কালচারের অনুসরণ আর পর্দার অন্তরালে তুর্কিস্থানকে একটি ইহুদি রাজ্যে পরিণত করা।

সোভিয়েত কম্যুনিস্টরা যেমন শ্রমিক ও নির্যাতিত মানুষের প্রাপ্য আদায়ের ছুতা দিয়ে ' কম্যুনিস্ট' ও ' সোশালিজম' তথা সমাজতন্ত্রের মতো এক হিংস্র ও লক্ষ লক্ষ মানুষের ' খুনি' এ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলো; তদ্রুপ তুরস্কেও সমাজের সাধারণ জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী- গুণী ব্যক্তিদের প্রতারিত করে এক ডাকাত ও মুসলিম বিদ্বেষী ইহুদি সংস্থা গঠন করে। সেটাই হলো তাদের ' ঐক্য ও উন্নয়ন সংস্থা' । এর মূল ভিত্তি হয় ১৮৬৪ সালে। এর সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের ' নতুন উসমানি' এবং ' উসমানি তরুণ' ' র মতো বিভিন্ন বাহ্যিক চমকপ্রদ উপাধিতে সম্বোধন করা হতো। এরাই লন্ডন থেকে ' স্বাধীনতা' নামে এক পত্রিকাও বের করে। এবং সালতানাতে উসমানিয়ার কাছে এক গণতান্ত্রিক শাসন দাবি করে। কিন্তু উসমানি খলিফা সুলতান আব্দুল হামিদ তাদেরকে কঠিনভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের দমাতে ১৮৭৬ সনে সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আইন জারি করা হয়। ১৮৭৭ সনে রাশিয়া যুদ্ধের ডাকঢোল পেটালে, সুলতান আব্দুল হামিদ পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। ঠিক তখনই ষড়যন্ত্রকারী সংস্থার লোকেরা সুলতানের বিরুদ্ধে আন্দোলন উসকে দেয়। এভাবেই শত্রুরা সুলতান আব্দুল হামিদের শাসনামলে দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের পুরাটাই নানাবিধ উপদ্রব আর ষড়যন্ত্রে অতিষ্ট করে রাখে। অবশেষে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সেই

ইহুদি সংস্থার কার্যত শাসনভার নযরে আসো এবং সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

ইহুদিবাদী এ চতুর আন্দোলনকারীরা বড় গলায় তুর্কি জাতিয়তাবাদের শ্লোগান তুলো কিন্তু বাস্তবতা হলো, এরাই সে নরাধম ইহুদি- খৃস্টান শক্তি, যারা আরব শাসকবর্গকে যারা তুর্কিদের বিরোধিতা করতে আরব জাতিয়তাবাদের শ্লোগান শিখিয়েছো এরপর আরবদের মাধ্যমেই তাদের দ্বীন ও ঈমান, ইলম ও সংস্কৃতি, রাজত্ব ও রাষ্ট্রনীতি- মোটকথা সকল ক্ষেত্রেই যেনো আবর্জনা ঢেলে দিয়েছো এভাবে প্রতারকের দলেরা আরবদের কিই বা বাকি রেখেছে? অথচ এতসবের উদ্দেশ্য শুধু একটাই ছিলো, তুর্কিকে পঙ্গু বানানো। এবং ইসলামি খেলাফাতের অস্তিত্বকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়া।

এ আন্দোলনের প্রবক্তা ইহুদি এজেন্ট মুস্তফা কামাল আতাতুর্কের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ হলে, রাষ্ট্রের সবখানে উলামা ও ইসলামি ব্যক্তিবর্গের জন্য জেল ও শূলির একমাত্র ব্যবস্থাই যেনো সে পছন্দ করো হাজার- হাজার আলেমগণকে শহিদ করো তাঁর কবল থেকে খুব অল্প সংখ্যক ধর্মপ্রাণ আলেম জান বাঁচিয়ে হিজরত করতে পেরেছেন। এই অভিশপ্ত ফেরাউনই তুর্কির শাইখুল ইসলামের মাথায় এ কথা বলে কুরআনে কারিমের নুসখা ছুড়ে মেরেছে যে, নিয়ে যা তোর কুরআন ও নিজের শরিয়ত!

নিকৃষ্ট এ মুসলিম বিদ্বেষীর শত্রুতার চাক্ষুষদর্শীদের মধ্যে আজ কেউই আর বেঁচে নেই........

(৩য়)

অন্যদিকে আল্লাহর সাহায্য ও ইশারায় হজরত শায়খ সাঈদ নুরসি রহ.[১২] এদের বিপরীতে ইসলামি বিপ্লবের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।

ফলে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত পদক্ষেপই অকেজো করে দেয়া হয়। তবুও তিনি হাল ছাড়েননি। হজরত শায়খ সাঈদ নুরসি রহ. আতাতুর্কের মুসলিম শত্রুতা, হিংস্রতা আর পাষণ্ডতা নিজ চোখে দেখেছেন। দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে আতাতুর্কের কারাগারে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। তিনি ঐ সময়ের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক খোদাদ্রোহিতার সয়লাবের সামনে এক ঈমানি ও কুরআনি আন্দোলন শুরু করেন। ছোটো ছোটো বই লিখে সেগুলো গোপনে অন্যান্য মুরিদদের মাধ্যমে হস্তলিখনি করে অসংখ্য নুসখা তৈরি করতে থাকেন। আর এভাবেই ধীরে ধীরে এ নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কোমর সোজা করার চেষ্টা চালান।

মোটকথা, তুরস্ক তখন এক কঠিন পরিস্থিতি পার করছিলো। একদিকে মুনাফেক জাতি আর তুর্কি ইসলামি খেলাফতের হৃদ-শত্রুদের ভেতরগত ষড়যন্ত্র, তো অন্যদিকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের

---

[১২] হজরত শায়খ সাঈদ নুরসি রহ.' র বিস্তারিত জীবনি পৃথকভাবে যুক্ত করা হয়েছে, যা সামনে আসবে...

ধ্বংসাত্বক থাকা তুর্কিস্থানকে ইউরোপিয়ান জোটের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য করে। জার্মানির পালায় পড়ে পরাজিত হয় তুর্কি সাম্রাজ্য। এ পরাজয়ের পর জার্মানির থেকে তুর্কিকেই অধিক অক্ষম করে দেয়া হয়। বলকানের বিশাল অংশ তুরস্ক থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। বলা যায়, ' তুর্কি জাতীয়তাবাদ' ' র প্রতিকারমূলক বাহ্যিক কর্ম ও উৎপাত আর ' আরব জাতীয়তাবাদ' ' র জাদুকরি ভাষ্য ও পাগলপনা আরব রাষ্ট্রগুলোকে তুর্কিস্থানের বিদ্রোহী করে তুলে। এদিকে দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে চতুর ইংরেজ ও ধোঁকাবাজ ফরাসিরা উসমানি খেলাফতের কোমরের পেছনে খঞ্জর বসিয়ে একে খণ্ড খণ্ড করার রাস্তা পরিষ্কার করে দেয়।

রাখে আল্লাহ, মারে কে?

তুর্কিস্তানই ক্রুসেডার ও ইহুদিদের বিশ্ব ষড়যন্ত্রের মূল শিকার ছিলো। তাই এদের সকল মাথাব্যথা তুর্কিস্থান কেন্দ্রিকই ছিলো। বরং আরো গভীরে গিয়ে বললে, উসমানি খেলাফাত ও ইসলামি নিদর্শনই ছিলো তাদের লক্ষ্যবস্তু। একে একে ইসলামি ঐতিহ্যগুলো নিশ্চিহ্ন করে তুর্কিকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। অবশেষে ইহুদি নেতা হরসেলের উদ্দেশ্য সফল হয়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের অর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরাই সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে মোস্তফা কামালের মাধ্যমে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এবং পরবর্তিতে ১৯২৩ সালে উসমানি খেলাফত ধ্বংসের ঘোষণা করে।

বিশতম শতাব্দীতে তুর্কির এ ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকে যে দু' মহান ব্যক্তিত্ব হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছেন, তাদের একজন হলেন হজরত শায়খ সাঈদ নুরসি রহ.। যিনি এ সকল ফেৎনার আগা-গোড়া স্বচক্ষে দেখেছেন। বেদনাতুর ও জরাজীর্ণ এ সময়ে নিজের চিন্তা- বিশ্বাসের সকল নিমগ্নতা এ দিকেই নিবদ্ধ করেন। আল্লাহর উপর ভরসা করে নীরবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তিত্ব তিনি হলেন, নাজমুদ্দিন আরবেকান। যিনি কামাল আতাতুর্কের পেছনে লুকিয়ে থাকা ইহুদি- খৃস্টানদের চালগুলো গভীরভাবে পাঠ ও উপলব্ধি করেছেন। এরপর সেগুলোকে এতোটা বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মভাবে দমন করেছেন যে, শুধু তুরস্কই নয়; সমগ্র বিশ্বেও তাঁর দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু তিনি যখন কাজ শুরু করেন, এর বহু পূর্বেই অভিশপ্ত সেই ফেরাউন - আতাতুর্ক - মারা যায়। শতো চেষ্টা- সাধনা, খুন- হত্যা করেও তুর্কি থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হয়নি। মানুষের দিল ছিলো সজাগ। জনগণ নিভৃতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আত্মশুদ্ধিতে ব্যস্ত ছিলো। আলেম - উলামা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ মানুষের মনমস্তিষ্ক পরিচ্ছন্নে পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। চীন, রাশিয়ায় যেভাবে সাধারণত মুসলিমগণকে আলেম- উলামা ও পীর- মাশায়েখ মিলে ঘাতক ও নৃসংশ খুনি কম্যুনিস্টদের ভয়ঙ্করতা থেকে রক্ষা করেন; ঠিক তেমনই তুর্কিতে রক্ত নদী বহিয়েও একদল আলেমদের কারণেই ইসলামের পতাকা পূর্ণ অবদমিত করতে পারেনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এরদোগান, সময়ের সুলতান আব্দুল হামিদ

(১ম)

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর আজাদির তরঙ্গ আর বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কার্যকলাপ মোস্তফা কামালের তৈরি করা সে তুরস্কের অবস্থা পাল্টাতে বড়ো ভূমিকা রাখে। কিন্তু ইসলামি মানসিকতার বিভিন্ন পার্টির আন্দোলন দমাতে অলিগলিতে নিকৃষ্ট ইহুদিদের তৈরিকৃত সৈন্য, পুলিশ আর অফিসাররা যেনো ঘাপটি মেরে বসে থাকতো। এবং ইসলামের গ্রীবা চেপে ধরতে থাকতো সদা প্রস্তুত।

ইহুদি এজেন্ট কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তার সামরিক উপদেষ্টা ইসমত ইনোনুকে (১৮৮৪- ১৯৭৩ ইং) প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। যে একই উম্মাত্ততা ও উম্মাদনায় পায়ে পা রেখে চলে।

১৯৪৬ সনে বিরোধি পার্টি জালাল বায়ার নেতৃত্বে ' ডেমোক্রেটিক পার্টি' ' র জয় হয়। ১৯৪৭ সনে কিছু ইসলামি সংস্থা কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আদনান মেন্দারিস জয় লাভ করেন। তিনি আরবিতে আজানের নিষিদ্ধতা তুলে নেন। পাশাপাশি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চায় মুসলিমদের সহযোগিতা করেন। এমনকি ১৯৫০ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত প্রায় পনেরোশো নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ইসলামি চিন্তা- চেতনার হওয়ায় ১৯৬০ সালে ইহুদি সেনাবাহিনী আদনান মেন্দারিসের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি ঘোলা করে তাঁকে জেলে নিক্ষেপ করে। অবশেষে মৃত্যুদণ্ডও দেয়।

সেনাবাহিনীতে জামাল গুরসেল আর মুস্তফা কামালের এজেন্ট ও মুসলিম শত্রুরা ভরপুর ছিলো। সব উপদ্রব মূলত এ অভিশপ্তই সৃষ্টি করেছিলো। এরপর ১৯৬৩ পর্যন্ত সে তুর্কির প্রেসিডেন্ট ছিলো। ১৯৬০' র পরে এক ইলেকশনে সুলাইমান দেমিরিলের ' জস্টিস পার্টি' ' র বিশাল জয় হয়। তখন ইসমত ইনোনুর সাথে সমঝোতা ও একাত্মতা ঘোষণা করে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ইসমত ইনোনুকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। ইসমত ইনোনু ছিলেন ইসলামপন্থী রাজনীতিবিধ। তাঁর এ ধর্মমুখী রাজনীতির কারণেই বেশি দিন মসনদে টিকতে পারেননি। অবশেষে ১৯৬৩তে ইসমত ইনোনু প্রেসিডেন্ট পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তখন জামাল গুরসেল সেনাঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে মসনদে বসেন। এবং মৃত্যুর আগে জেনারেল জওদতকে ১৯৬৬ সনে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেন। তার মৃত্যুর পর সুলাইমান দেমিরিল এবার খোলামেলাভাবেই ইসলামের প্রতি টান ও আকর্ষণ প্রকাশ করতে থাকেন।

(২য়)

মিল্লি গুরুশ ও রিফাহ্ পার্টি প্রতিষ্ঠা এবং এরদোগানের ভূমিকা

রজব তাইয়েব এরদোগান। জন্ম ১৯৫৪ সালে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তুরস্কের সম্মিলিত ইমাম-খতিবদের তৈরি নিজস্ব সিলেবাসের মাধ্যমিক ইসলামিক স্কুলে পড়াশোনা করেন। এরপর মরমরা ইউনিভার্সিটিতে ব্যবসা ও ইকোনোমি বিভাগে ভর্তি হন। ঐ সময়ই তিনি নাজমুদ্দিন আরবেকানের 'হিজবুস সালামাতিল ওতানিল ইসলামি' বা 'National Islamik Peace Party' 'র যুব দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হন। কিছুদিন পর ইস্তাম্বুলের যুব দলের সভাপতি নির্বাচিত হন।

নাজমুদ্দিন আরবেকান শুরুতে ইস্তাম্বুল ইউনিভার্সিটিতে অটো মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। শুরু থেকেই তিনি ইসলামমুখী সুলায়মান দেমিরিলের 'জস্টিস পার্টি' 'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নাজমুদ্দিন আরবেকান নিজের ও তুর্কির ইসলামাইজেশনের প্রকাশ্য প্রচারক ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৯'র ইলেকশনে সুলায়মান দেমিরিল সতর্কতাবশত নাজমুদ্দিনের নাম প্রকাশ করেননি। আর সে থেকেই নাজমুদ্দিন আরবেকান তাঁর থেকে পৃথক অবস্থান করেন। সতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়ে পাশও করেন। ১৯৭০ সালে 'মিল্লি গুরুশ' বা 'National Vision' নামে পৃথক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এ পার্টির প্রকাশ্য ইসলাম

প্রচারের দরুণ ১৯৭৭ সালে এক সেনাবিপ্লবের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১৯৭২ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকান "হিজবুস সালামাতিল ওতানি" নামে দল গঠন করেন। এবং তাঁর প্রিয় ও আস্থার প্রতীক সুলায়মান আরেফের কাঁধে এর প্রধান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মাত্র এক বছরের মাথায় ১৯৭৩ সালেই বিশাল জয় পায় এ পার্টি। তবে তারা মার্কিন নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান পার্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি পরিচালনা করেন। আরবাকান তখন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এ সময় আলেম- উলামা ও ইমাম- খতিবগণ অনেক মাদ্রাসা তৈরির সুযোগ পান। আরবাকান আবারও প্রকাশ্যে ইসলামি হুকুমতের দাওয়াত দিতে থাকেন। ফিলিস্তিন সমস্যা তিনিই পূর্ণ জোরদারভাবে পেশ করেন। ইসরাইলের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা তুলতে থাকেন। সুদি নেযাম বিলুপ্তির প্রস্তাবও তুলেন। অবশেষে ১৯৮০ সালে পুনরায় সেনাবিপ্লব ঘটে। সকল প্রকার পার্টি; বিশেষকরে আরবাকান ও তাঁর দলের উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। জেনারেল কেনআন ছিলো এ বিপ্লবের ইন্ধনদাতা। পরবর্তিতে সে তুর্কির প্রেসিডেন্টও হয়।

১৯৮৩ সালে নাজমুদ্দিন আরবাকান ' রিফাহ পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এরদোগানও তাতে যোগ দান করেন। এরদোগান নাজমুদ্দিন আরবাকানকে নিজের উস্তাদ ও মুরব্বি মনে করতেন। আরবাকানও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। কিছুদিন পর এরদোকানকে রিফাহ পার্টির ইস্তাম্বুল শাখার সভাপতি বানিয়ে দেওয়া হয়।

(৩য়)

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

১৯৮৯ সালে রিফাহ পার্টি বড় জয় পায়। ইস্তাম্বুলে এরদোগানও জয় লাভ করেন। ১৯৯১তে তিনি দলের পক্ষ থেকে পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন। ১৯৯৪তে মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি নিজের কর্মদক্ষতায় ইস্তাম্বুলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সোনায় সোহাগা করে তুলেন। ১৯৯৭ সালে এক আবেগময় ভাষণের কারণে এরদোগানকেও গ্রেফতার করা হয়। ফলে এক বছর জেলে থাকেন তিনি। জেলে বসে তিনি চিন্তা করলেন, উস্তাদের স্পষ্ট পলিসির কারণে শত্রুরা যে সুযোগ নিচ্ছে, সেটা বন্ধ করতে হবে। এবং 'Tit for Tat' বা ' যেমন কুকুর তেমন মুগুর' ' র মতোই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি এমন এক নতুন পার্টি তৈরির নকশা আঁকলেন- শত্রুর রাজনীতির জওয়াব দেওয়া হবে তাদেরই প্রণীত রাজনীতি দিয়ে।

এদিকে ১৯৯৭ সালেই প্রকাশ্য ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতার দরুণ রিফাহ পার্টিকে সেনাবাহিনির সহায়তায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়। এবং ড. নাজমুদ্দিন আরবাকানের উপর আদালাতের পক্ষ থেকে এ পাবন্দিও আরোপ করা হয় যে, তিনি কোনো প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতায় যোগ দিতে পারবেন না। ১৯৯৮তে নাজমুদ্দিন আরবাকান নতুন করে ' হিযবুল ফযীলা' গঠন করেন। ১৯৯৯' র নির্বাচনে এরা এগিয়ে থাকে। পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আব্দুল্লাহ গুল

ও এরদোগান অন্যান্য দলের প্রকাশ্য ' বিরোধিতার পলিসি' বাদ দেওয়ার আওয়াজ তুলেন। কিন্তু পার্টি নিজের গতিতে এগুতে থাকে। প্রকাশ্যে ইসলামি মানসিকতা প্রচার করতে থাকে। অবশেষে ২০০০ সালে সেনাবিপ্লব ঘটে। ভেঙ্গে দেওয়া হয় ' হিজবুল ফযীলা' । এবং আরবাকানকে গ্রেফতার করা হয়। তখনই এরদোগান ' জস্টিস এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি' নামে এক নতুন দল গঠন করেন। এদিকে নাজমুদ্দিন আরবাকানও ' হিজবুল ফযীলা' ' র পর ' হিজবুস সাআদা' তথা ' সাদাত পার্টি' নামে নতুন দল তৈরি করেন।

এরপর ২০০২' র ইলেকশনে রজব তৈয়ব এরদোগানের জস্টিস পার্টি নিজেদের কর্মকৌশলে বিশাল জয় লাভ করে। এমনকি এ্যারদোগানের পার্টিই তখন তুর্কির সবচেয়ে বড় পার্টি হয়ে আবির্ভূত হয়। অন্যদিকে নাজমুদ্দিন আরবেকান দশ পার্সেন্ট ভোটও পাননি। অবশেষে তাঁকে পার্লামেন্ট পদও ত্যাগ করতে হয়।

(৪র্থ)

তৃতীয় সহস্রাব্দী, তুরস্কের নয়াদিগন্ত ও এরদোগানের কর্মকৌশলতা

(ক)

দ্বিতীয় সহস্রাব্দী তথা ২০০০ সাল শেষ হতেই সম্ভাবনাময় তৃতীয় সহস্রাব্দী চলে আসে। এ সহস্রাব্দীর শুরু থেকেই তুরস্কের

রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যাতে রাজনীতির মুকাবেলায় শুধু ধর্মীয় ও জাতীয় সেবা- পরিসেবার শ্লোগান দিয়েই নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক পলিসিতে রাজনীতির শরীরকে রাজনীতি দিয়েই ঘায়েলের এক ভিন্ন কৌশলের প্রারম্ভ হয়।

সেকুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মুখে কুলুপ এঁটে দেওয়া হয়। সেকুলারিজমের জোর- জবরদস্তিকে ডেমুক্রিসি তথা গণতন্ত্রের মাধ্যমে আটকানো হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কের জোরদার দাবি জানানো হয়। সাথে সাথে ইউইউর নিয়ম- নেযামও ঐ একই বাহানায় ব্যাবহার করা হয়। যার উদ্দেশ্য রাজ্যে ইউরোপীয় কৃষ্টি- কালচার আর সভ্যতা- সংস্কৃতি ছড়ানো নয়। বরং এর গ্রহণীয় ও সহনীয় পজেটিভ পয়েন্টগুলোর চয়েজই মূল লক্ষ্য। গণতন্ত্র নামক ইউরোপের ঐ নিয়মগুলো বাস্তবায়ন করে সেকুলারিজম তথা গায়ের জোরে স্বৈরচারের নির্মম, রাক্ষুসে থাবাকে প্রতিহত করাই মূল লক্ষ্যবস্তু। ইহুদি ও সোভিয়েত শক্তিকে প্রতিহত করাই উদ্দেশ্য। যাতে রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা জুলুমে জর্জরিত না হয়ে ন্যায়ের সীমানায় থাকে। এবং মানবতার হক যেনো যথাযথভাবে আদায় হয়।

এগুলোই হলো রজব তাইয়েব এরদোগানের পলিসি ও কর্মকৌশল। তাই আপামর জনগণ এরদোগানের কাজ দেখে সন্তুষ্ট। কারণ, তিনি তাদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিৎ করছেন। সেনাবাহিনীও চুপচাপ ছিলো। কারণ, তাদের পকেট ঠাণ্ডা হতে দেয়া হইনি। ধর্ম পালনে স্বাধীনতা, পর্দার ইচ্ছাধিকার, ধর্মীয় শিক্ষার আজাদি, এগুলো ডেমুক্রিসি ও সেকুলারিজমের প্রকৃত চাহিদা। এরদোগান

মূলত এ চাহিদাগুলোকেই বাস্তবে রুপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাহ্যত এসব নিয়মকেও ইউরোপিয়ানরা তাদের ধর্মহীনতার বিরোধিই মনে করে। তাই পররাষ্ট্রনীতি আরো ব্যাপকতর, নরমপন্থী, আর বন্ধুত্বসূলভ হওয়াই কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। এরদোগান সুকৌশলে সেই বন্ধুত্বসূলভ আচরণকেই নিজের পলিসি হিসেবে গ্রহণ করেন।

(খ)

উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ যুগে আরব বিশ্ব ও মধ্য প্রাচ্যের সাথে ছিন্ন সম্পর্ক এ্যারদোগান প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এরদোগান ফিলিস্তিনকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বকে একমত করার চেষ্টা করেন।

ইহুদিরা নানা ষড়যন্ত্রে তুরস্ককে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছিলো। এদিকে ইউরিপিয়ানরা তুর্কিস্থানকে "রোগ জীবাণু" আখ্যা দিয়ে এর নাভি চেপে ধরেছিলো। স্পষ্টত, এসব একজন দুশমনেরই কাজ হয়ে থাকে। এদিকে ড. নাজমুদ্দিন আরবাকান বিশ্ব শাসন- ব্যবস্থাকে ইসলামি ব্যবস্থায় রুপান্তর করার প্রকাশ্য প্রচারক ছিলেন। তাঁর চিন্তা- চেতনা আপন জায়গায় শতো পার্সেন্ট সঠিক ছিলো। কিন্তু আশপাশের মুনাফেক ও চক্রান্তকারী সম্প্রদায় তাঁকে সামনে এগুতে দিতো না। কিন্তু লোক মুখে প্রচলিত আছে- ' সাঁপ মরবে ঠিকই, কিন্তু লাঠি ভাঙ্গবে না' । রজব তৈয়ব এরদোগান মূলত এ কৌশলই অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও একনিষ্ঠতার

সাথে প্রয়োগ করেন। ল্যাবেল যেটাই হোক না কেনো; কিন্তু ভেতরগত বিষয়টি ছিলো অন্যরকম! এটা ছিলো কর্ম- নিপুণতার এমন নিবিড় রহস্য যা তুর্কির জওয়াব তুর্কির মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়েছে। কোনো লিফলেটবাজি নয়; বরং কাজের মাধ্যমেই সকল এ্যান্সার দিয়েছেন। অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বনির্ভরতার দাবি ছিলো সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন। এরদোগান ধীরে ধীরে সেদিকেই পা বাড়াচ্ছিলেন। যাতে জনসাধারণের আস্থাও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এমনকি দশ- পনেরো বছরে এরদোগানের অর্থনৈতিক কৌশলে তুরস্ক নিজস্ব ঋণমুক্ত হয়ে যায়। তিনি তুরস্ককে রপ্তানিকারক দেশ থেকে উন্নত দেশের তালিকায় নাম লেখান।

২০০৭' র ইলেকশনে এরদোগান- পার্টির পূর্ব থেকে অনেক বেশি সফলতা অর্জন হয়। পার্লামেন্টে তাদের ৩৪১টি সিট মিলে। এবং ৪৭% ভোট পায় তারা। এরপর ক্ষমতার নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই এরদোগান আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করতে প্রস্তুত হন। ইসলামি মনোভাবের কারণে তিনি ছিলেন তুরস্কের একজন পরিচিত মুখ। এবং এরদোগানের পুরোনো বন্ধু।

(৫ম)

আরবাকানের মৃত্যু, এরদোগানের একক কর্তৃত্ব

এ সময়ে তুরস্কের রপ্তানি ১১৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়। লোকেরা বলতে থাকে, ২০২৩ পর্যন্ত তুরস্ক হবে বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত রাষ্ট্রগুলোর একটি। এ সব বিষয় লক্ষ্য করে এরদোগান

বিচার ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনেন। সেনাবাহিনীর পেছনে গোপন পৃষ্ঠপোষক ইহুদি সংস্থা ' আরজংকোনে' - এ হস্তক্ষেপ করেন। দেয়ালের ওপার থেকে যারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারী ও ধোঁকাবাজ জেনারেল তৈরিতে মদদ যোগাতো। এরদোগান তাদের মুখোশ উন্মোচন করে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃতদের সংখ্যা প্রায় ৮০ হবে। এভাবে তিন হাজার মিলিয়ন ডলার ট্যাক্স চুরির অপরাধে ' দোজান' নামি মিডিয়া গ্রুপের পরিচালকদের আটক করেন। এবং তাদের ডাকাতির পর্দা ফাঁস করেন।

রজব তৈয়ব এরদোগান সাংবিধানিক কিছু পরিবর্তন আনতে গণভোটের ব্যবস্থা করেন। এবং উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন হয়। অবশেষে তিনি তুরস্কের সবচেয়ে বড় কর্তৃত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাধর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

২৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনের পূর্বেই এরদোগানের উস্তাদ নাজমুদ্দিন আরবাকানের এন্তেকাল হয়ে যায়। ততোদিনে তাঁর সাদাত পার্টি অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর পার্টিতে তাঁর সমকক্ষ কোনো নেতা কিংবা সচিব অবশিষ্ট ছিলো না। তাই ১১' র নির্বাচনে এরদোগানের বিশাল জয় হয়। ৫০% ভোট তাঁরই পক্ষে আসে। অথচ সম্পূর্ণ ভোটই ছিলো মাত্র ৮৬%!

(৬ষ্ঠ)

২০১১, আরব বিশ্বের সংকট আর তুরস্কের নতুন যুগে পদার্পণ

২০১১' র সময়টা ছিলো আরব বিশ্বে গণবিপ্লবের ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার বছর। তিউনিসিয়ার সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। লিবিয়া সরকারকে হত্যা করা হয়। মিসর সরকারকে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। ইয়েমেনের সরকারগোষ্ঠি গৃহ যুদ্ধের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকে। সিরিয়া সরকার ইসরাইলের গোপন এজেন্ট হিসেবে প্রাদুর্ভূত হয়। আর এ থেকেই তুরস্ক নতুন যুগে প্রবেশ করে। এ সময় তুরস্ক আরব বিশ্বে গণবিপ্লবের সাথে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় তুরস্ক তিউনিসিয়ার রাশেদ ঘানুসি ও মিসরের ড. মুরসির গণতান্ত্রিক পদক্ষেপকে প্রকাশ্য সমর্থন করে। এর পাশাপাশি এরদোগান গাজার প্রতিরক্ষা সংস্থা হামাসের পক্ষাবলম্বন ও সহযোগিতা করেন। তুরস্কে সিরিয়া ও আরব বিশ্বের অন্যান্য নির্যাতিত মুহাজিরগণকে অকপটে অভ্যর্থনা জানান। এ যেনো তুরস্কে আনসার- মুহাজিরগণের সে পুরোনো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি! বার্মার মুসলিমদের পক্ষে জোরগলায় আওয়াজ তুলেন। তাদেরকে সহযোগিতা করেন। বাঙলাদেশে তাদের আবাসস্থলের সুযোগ করে দিতে আহ্বান জানান।

বিশ্ব মুসলিম জাতির জন্য তুরস্কের এ অবদান যেনো উসমানি খেলাফাতের সে পূর্ব ঝলককেই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেনো শীঘ্রই হারানো সেই অতিত ফিরে আসছে, যখন তুর্কিস্তান ইসলামের

প্রধানকেন্দ্র বিবেচিত হতো! তুরস্ক ৩০- ৪০ লক্ষ শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদেরকে শুধু পুনর্বাসনই করে দেয়নি, বরং সিরিয়ান মুজাহিদ সংস্থাগুলোকে প্রকাশ্যে মদদও করে৷

সিরিয়ার এ কুৎসিত চেহারায় একাকার হয়ে ইরানও যেনো সুন্নিদের বিপক্ষে বিষ দাঁত কড়মড় করে৷ এখানেই আমেরিকার মিথ্যাবাদী, জালিয়াতিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের আত্মমর্যাদাহীন, নির্লজ্জ রাজনীতিটা খোলস থেকে বেরিয়ে আসে৷ রাশিয়া ১৯১৭' র সে ফ্যাসিস্ট, খুনি ও হিংস্র কম্যুনিস্ট নীতির কালো থাবার অগ্নি হয়ে, নিজেদের সব ধ্বংসাত্মক জাহান্নামি অস্ত্রের সাথে ময়দানে অবতীর্ণ হয়৷ ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে এতোটা গান্দেগি ও দাজ্জালিপনা ছড়ায়, পৃথিবীর অতিত ইতিহাসে এর নমুনা পাওয়া ভার৷

এদিকে একমাত্র তুরস্কই সকলের সাথে একাই মোকাবেলা করে যায়৷ এ সময় আরবাকান থাকলে রাজনৈতিক ' ক্রোস- ওভারটেকে' - ই হয়তবা তুরস্কের দিনাতিপাত হতো৷ কিন্তু সৌভাগ্য যে, আল্লাহর মেহেরবানিতে এরদোগানের স্বরাষ্ট্রনীতিই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইসরাইল, আমেরিকা ও রাশিয়ার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়৷

(৭ম)

এরদোগানের বিরুদ্ধে আমেরিকার ষড়যন্ত্র ও আল্লাহ্‌র সাহায্য

এরদোগানের ক্ষমতায় আসার পূর্ব পর্যন্ত ইসরাইল, আমেরিকা এবং তাদের দোসর মুনাফেক আরব শাসকরা মিলে সমগ্র তুরস্কে যেনো গুণ্ডাবৃত্তি, দাঙ্গা আর শহরে শহরে হট্টগোল ও নোংরা পরিস্থিতির বাজার তৈরিতে ছিলো। ইসরাইল ও আমেরিকা তাদের গুণ্ডাবৃত্তি ও দুর্বৃত্তি তুরস্ক থেকে শুরু করে তিউনিসিয়া পর্যন্ত বিস্তার করে। ফলে তিউনিসিয়ার শাসক পালিয়ে রিয়াদে আশ্রয় নেয়। এভাবে এরাই মূলত লিবিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাঁধায়। মিসরের গণতান্ত্রিক শাসনে এরাই রক্তের হোলি খেলা শুরু করে। অবশেষে সেখানে ইসরাইলি এজেন্টদের হুকুমত কায়েম হয়। এরাই মূলত কৌশলে ইয়েমেনে শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের শুধু এ কারণেই শক্তিশালী করে যে, যেন ইখওয়ান- ব্রাদার হুড কিংবা অন্য কোনো ইসলামি সংস্থার কেউ ইয়েমেনে কর্মতৎপরতা চালাতে না পারে। এরপর এদের মাঝেও গৃহ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া হয়। এভাবে ইয়েমেনকেও তারা আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করে।

এরাই মূলত সে মাফিয়া গ্রুপ, যারা আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা এবং গভীর নীল নকশায় মুসলিমদের ধর্মীয় নেতা ফাতহুল্লাহ গুলেনকে তুরস্কের ভেতরগত চক্রান্তে নিয়োজিত রাখে। চক্রান্তের পেছনে ইসরাইল, আরব আমিরাত, মিসর ও সৌদি আরবও মিডিয়ার গোপন ব্যবহার করে। অবশেষে ২০১৬' র জুলাইতে

রাতের বেলা ডাকাত ও মাফিয়া গ্রুপের মতো এক নাপাক সেনাঅভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। আল্লাহ না করুন- এটা সফল হলে তুরস্ক আরেকবার ১৯১৭- ১৮তে ফিরে যেতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন রকম। মযলুমানের রক্ত, তাদের চিৎকার- কান্না তুরস্কের সঙ্গি হয়। এবং বিপ্লব বিফল হয়। আর এ বিপ্লবে জনশক্তির পাশাপাশি নীতিগত ও রাজনৈতিক- সকল ক্ষেত্রে এরদোগান আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিধর হয়ে উঠেন।

এর পরপরই এরদোগান ২০১৮' র বিপ্লবের প্রস্তুতি শুরু করেন। যাতে প্রেসিডেন্সি নীতির ভিত্তিতে পূর্ণ সক্ষমতার সহিত এরদোগান ও তাঁর পার্টির সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাওয়ার কথা। এরপর যাতে ২০২৩শে পৌঁছে তুর্কির একশো বছরের লাঞ্চনার অবসান ঘটানো যায়।

সেনাবিদ্রোহের পেছনে মাফিয়া গ্রুপটি চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে এরদোগান ও তাঁর পার্টিকে ইলেকশনে ফেল করাতে আধাজল খেয়ে মাঠে নেমেছিলো। একদিকে আরবসহ পুরো বিশ্বের বহিরাগত সকল চক্রান্তগোষ্ঠি এবং ভেতরের কামাল- এজেন্টরা; তো অন্যদিকে এরদোগানের সাথে তুরস্কের একনিষ্ঠ, ইমানদার মুসলিম সম্প্রদায়সহ বিশ্ব মুসলিম জাতির সৎ, নিষ্ঠাবান আর বুজুর্গ সাধারণ নরনারীদের চোখের পানি এবং কায়মনোবাক্যে দরবারে ইলাহিতে কান্না ও রোনাজারি!

২০১৮' র ২৪ জুন। একটি ঐতিহাসিক ফায়সালা হবে! আল্লাহর বরকতময় রমজান মাসে পুরো মুসলিম উম্মাহ মুনাফেকদের

বিরুদ্ধে দুআ করছিলো সেদিন। কুনুতে নাজেলা পড়ছিলো। এরদোগানের জন্য দুআ করছিলো। মনে হচ্ছিলো, এরদোগান যেনো এ যুগের সালাহুদ্দিন আউয়ুবি! কিংবা মুহাম্মাদ আল ফাতেহ!! না, কমপক্ষে তিনি সুলতান আব্দুল হামিদ!!! মানুষ তাঁকে আকাঙ্খার ডানায় ভর করে খেলাফাতে উসমানিয়ার স্বপ্নদ্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক, ইসলামি বিশ্বের হিরো আর মুসলিম জাতীয়তার আব্রু ভাবতে শুরু করছে! অবশেষে নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদ ও প্রার্থনায় তিনি ২০১৮' র ইলেকশনে পূর্ণ সফলকাম হন। মুবারকবাদ তাঁকে! স্বাগতম ও শুভেচ্ছা এরদোগান!! তোমার হাতে আজকের মানবতা একটি ভবিষ্যৎ "তুর্কিস্থান" দেখার ইচ্ছায় অধীর আগ্রহে বসে আছে!

ইস্তাম্বুলে যেনো বসন্তের হাওয়া বয়ে চলছে

মূল
ড. প্রফেসর মুহসিন উসমানি নদভি

(প্রবন্ধটি মূলত হিন্দুস্তানের জওহারলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি, দিল্লির প্রফেসর, হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ লেখক, গবেষক আলেম ডক্টর মুহসিন কাসেমি নদভির লিখিত "তুর্কি, মিসর, সৌদি আরব আওর ইখওয়ান" নামক রেসালার একটি অংশ। সেখান থেকেই তুর্কি বিষয়ক প্রবন্ধটি অনুবাদ করা হয়েছে।)

আল ইত্তেহাদুল আলামির কনফারেন্স

'আল ইত্তেহাদ আল আলামি লি উলামাইল মুসলিমিন' তথা বিশ্ব মুসলিম আলেম- উলামা আন্তর্জাতিক ঐক্য সংস্থা। কাতারে এর হেড অফিস অবস্থিত। আল্লামা ইউসুফ কারযাভি এর প্রেসিডেন্ট। শায়খ ডক্টর আলি মুহিউদ্দীন কারাদাগি হলেন সংস্থাটির জেনারেল সেক্রেটারি। সুদানের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ ডক্টর ইসামুদ্দীন আল বশির এবং সৌদির শায়খ সালমান আওদা এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বিশ্বের প্রায় আঠারোশো আলেম এই সংস্থার সাথে সরাসরি যুক্ত। পাশাপাশি এর আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আলমদের সংখ্যা যোগ করলে তা প্রায় দশ হাজারে পৌঁছবে। মুসলিম বিশ্বের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যখন মিসর, সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ফিলিস্তিন সহ সমগ্র আরবে বিজাতীয় রাজনীতির কুপ্রভাব ও প্রতাপের ডামাডোল চলছে, মুসলিম বিশ্বের এমন করুণ কালে ইস্তাম্বুলের সেই ঐতিহাসিক কনফারেন্সের দাওয়ানামা পেলাম। তখন মনে হচ্ছিলো, সত্যিই বুঝি বসন্তের ফুলেরা গাছের ডগায় ডগায় ফুটতে শুরু করবে। রাতের তিমির শেষ হলেই বুঝি ঈদের খুশিরা নেচে উঠবে।

খুশির কারণ হলো, বিশ্বখ্যাত শতো শতো বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিধ আলেমদের মিলনমেলা হবে। তাদের সাথে বিশ্ব পরিস্থিতির সুরাহা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। মতবিনিময় হবে।

চৌদ্দশত বছর পূর্বে রাসুলে কারিম (সা.) কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। বলেছেন,

لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها

নিশ্চয়ই কুস্তুন্তুনিয়া বিজয় হবে। কতোই না উত্তম হবে এর বাদশাহ! কতোই না উত্তম হবে তাঁর সেনাবাহিনী!![১৩]

ইস্তাম্বুল বিজয়ের এই সৌভাগ্য অর্জন করতে সর্বপ্রথম হজরত আমির মুআবিয়া রা. লশকর তৈরি করেন। সেই বাহিনিতে হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রা.ও শরিক হয়েছিলেন। তাদের পরে অনেকেই এ শহর জয়ের চেষ্টা করে যান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ রহ.'র ভাগ্যে সেই সৌভাগ্য লিখে রেখেছিলেন। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কুস্তুন্তুনিয়াকে তাঁর রাজ্যের রাজধানী বানিয়েছিলেন। তৎকালীন কুস্তুন্তুনিয়া আজ ইস্তাম্বুল নামেই প্রসিদ্ধ। আমাদের আল ইত্তেহাদ আল আলামির কনফারেন্স এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কনফারেন্সের মূল বিষয়বস্তু ছিলো, 'মুসলিম জাতির নবজাগরণে উলামায়ে কেরামের অবদান'।

হিন্দুস্তান থেকে মাওলানা জালালুদ্দীন উমারি, ডক্টর জফর ইসলাম খান, মাওলানা এনায়েতুল্লাহ সুবহানিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া আরবের আরো অনেকেই ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটগুলোতে কাতার ও তুরস্কই সাধারণত সবচেয়ে বেশি ন্যায়সঙ্গত ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকে। তুরস্ক সিরিয়ার পনেরো লাখ মুহাজিরকে আশ্রয় প্রদান করেছে। বছরের পর বছর তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কনফারেন্সেও এ দু' রাষ্ট্রের মধ্যপন্থার প্রভাব নজরে পড়ছে।

তুরস্ক ও আরব সম্পর্ক

তুরস্ক ও আরব পাঁচশো বছর পর্যন্ত একই খেলাফতের অধীনে ছিলো। তাদের ইতিহাস একই ধারায় চলছিলো। ১৫৩৪ খৃস্টাব্দে সুলতান সুলাইমান কানুনি রহ.'র বাগদাদ বিজয় থেকে শুরু করে

---

[১৩] মুসনাদে আহমাদ- ৪/৩৩৫, হাকেম- ৪/ ৪২২, তারিখে কাবির- বুখারী- ২/ ৮১

১৯০৯ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ও আতাতুর্ক কর্তৃক সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে অপসারণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় পাঁচশো বছর। অতঃপর মুসলিম খেলাফতকে ভেঙ্গে দিতে বৃটিশরা জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তুলে আরবদেরকে তুর্কি খেলাফতের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। আরবরা ষড়যন্ত্রের বশবর্তী হয়ে বিদ্রোহ করে বসে। সুযোগ পেয়ে তাই বৃটিশরা আরব ভূখণ্ডগুলোতে নিজেদের করায়ত্ত প্রতিষ্ঠা করে। ওদিকে বৃটিশরা স্বয়ং তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ককে খেলাফতের বিরুদ্ধে সমর্থন ও সহায়তা করে যায়। অবশেষে আতাতুর্ক ধ্বংস করে দেয় মুসলিম ঐতিহ্যবাহী খেলাফত ব্যবস্থা। নয়া তুরস্কের নামে রাষ্ট্রব্যাপী ধর্মহীনতার সয়লাব ছড়িয়ে দেয়। আরবি অক্ষরের পরিবর্তে বৃটিশ অক্ষর জারি করে। আজান নিষিদ্ধ করে। ইসলামি শিক্ষার উপর পাবন্দি আরোপ করে। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও তুর্কি জনগণের হৃদয়ের গহীন থেকে ইসলামের ভালোবাসাকে দূরীভূত করতে সক্ষম হয়নি। অবশেষে ২০০২ সনে নাজমুদ্দীন আরবেকানের হাত ধরে শুরু হয় নতুন বিপ্লবের ধারা। নাজমুদ্দীন আরবেকানের পরে তাঁর শাগরেদ রজব তইয়্যিব এরদোগান অত্যন্ত দক্ষতা ও কর্মকুশলতার মাধ্যমে রাষ্ট্রে ইসলামি পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চালান। এভাবে তুরস্ক বিশ্বমুসলিমদের আশার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যায়। কিন্তু মানবতার ধ্বজাধারী ইউরোপের স্বার্থবাদীদের তা সহ্য হওয়ার কথা নয়। তারা হয়ত সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ কর্তৃক রোমান পরাশক্তির বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের কথা এখনো ভুলতে পারছে না। তাই মিসর, সিরিয়ার মতো তুরস্কেও নতুন কোনো সিসি কিংবা আসাদের উত্থান চায় ওরা। দুআ করি, আল্লাহ যেনো তুরস্ককে মিসরের মতো না করেন! যেখানে ইউরোপ ও ইসরাইল মিলে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ক্ষমতা হটিয়ে ওদের কোনো চাটুকরকে মসনদে বসিয়েছে।

তিউনিসিয়া ও মিসর

মিসরের মতো তিউনিসিয়াতেও একই পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। কিন্তু রাশেদ ঘানুশী সুকৌশলে তা সামাল দেন। তবে, মিসরের বিষয়টা ছিলো আরো গভীরের। মিসরের সাথে ইসরাইলের ভবিষ্যতের প্রশ্ন ছিলো। তাই বিশ্বের মোরলরা তাদের জাতি ভাইদের বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এদের সাথে স্বার্থপর আরব শাসকরা মিললে তাদের শক্তিতে দ্বিগুণ সঞ্চার হয়। মুসলিম বিশ্বের সেবা করার পরিবর্তে আরব শাসকরা নিজেদের পেট বাঁচাতে শত্রুদের বন্ধু হতেও দ্বিধাবোধ করেনি।

আমার বড় আফসোস হয় সে সব আরব আলেমদের জন্যে, যারা মুসলিম বিশ্বের করুণ মুহূর্তেও স্বার্থান্বেষী নেতাদের বিরুদ্ধে জনগণকে কোনো দিশা দেয়নি। বরং তাদের সাথে নমনীয়তা করে চলেছে। সরকারি লোকদের সাথে উঠাবসা করে পকেট গরম করেছে; কিন্তু ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো তারা জালেম সরকারের কথায় ইসলামি দল ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলে আখ্যা দিয়েছে! অথচ কুরআনে কারিমে স্পষ্ট এসেছে,

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

তোমরা জালেমদের প্রতি সামান্যও ঝুঁকো না। (সুরা হুদ, আয়াত- ১১৩)

ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে অপসারণ করে ইখওয়ানের সদস্যদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হয়। হত্যার বিরুদ্ধে মিসরের জনগণ ও ইখওয়ানের সদস্যবৃন্দ প্রতিবাদ জানালে তখনও কোনো কোনো আলেম বলছিলো, ইখওয়ান এখন আগের মতো নেই, তাদের এভাবে প্রতিবাদ করা ঠিক হচ্ছে না, বরং রাজনীতি বাদ দিয়ে দরস, তাদরিসে মনোযোগ দেয়া দরকার!

কিন্তু শায়খ হাসানুল বান্নার শাগরেদগণ তাদের কথায় কান দেয়নি। কারণ, তারা জানে, সর্বদা জুলুমকে মাথা পেতে মেনে নেয়া কাপুরুষতা বৈকি।

রজব তাইয়্যিব এ্যারদোগান ও ফাতহুল্লাহ গুলেন

রজব তাইয়্যিব এ্যারদোগান এ ক্ষেত্রে সকলের থেকে ভিন্ন। শত্রুদের বিরুদ্ধে সরাসরি ইসলামের সুরে না গেয়ে সুকৌশলে রাজনীতির পরিবর্তে রাজনীতির মাধ্যমে জোয়াব দেয়াই তাঁর প্রধান অস্ত্র। তাই তিনি সবার চেয়ে অনেক বেশি সফল। ধীরে ধীরে একের পর এক পথ মাড়িয়ে তিনি নিজের মসনদকে পোক্ত করে তুলেছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এ্যারদোগানের সফলতা ও বিজয়ের পর তাঁর ক্ষমতা আরো মজবুত হয়ে যায়। রাজনীতি, অর্থনীতি আর ইসলামপ্রীতির হাতিয়ার ব্যবহার করে এ্যারদোগান বিশ্বমুসলিমদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তিনি বিশ্বের একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক, যিনি ইসলাম ও মুসলিম জনগণের পক্ষ হয়ে বাশার আল আসাদের জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন। সিরিয়ার শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন। মিসরে তিনি ইখওয়ানের পক্ষাবলম্বন করেছেন। সিসির ষড়যন্ত্রমূলক সেনা অভ্যুত্থানের নিন্দা জানিয়েছেন।

তুর্কিদের রগরেশায় দ্বীনি চেতনা ও ইসলামের ভালোবাসা বিদ্যমান। কিন্তু ইতিহাস বলে, ইসলামমুখী দলগুলোর সব সময় বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মুখোমুখী হতে হয়। ফাতহুল্লাহ গুলেন কর্তৃক নব সংঘটিত সেনাবিদ্রোহ সেই ষড়যন্ত্রগুলোরই একটি। গুলেন সেনাবাহিনির একটি অংশকে বিগড়িয়ে এ্যারদোগানের বিরুদ্ধে উসকে দেয়।

ইউরোপের হাজারো ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও শত্রুদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে রজব তাইয়্যিব এ্যারদোগান তুরস্ককে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি দিয়ে পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে

জনগণ মনে- প্রাণে তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করেছে৷ তাই ফাতহুল্লাহ গুলেনের বিভিন্ন প্রপাগান্ডায় তারা বিভ্রান্ত হয়নি৷

আল ইত্তেহাদুল আলামির কনফারেন্সে অংশ নেয়া তুর্কিদের থেকে গুলেন সম্পর্কে যতোটুকু জানতে পেরেছি তা হলো, তুরস্ক ও ইরানের সীমান্তবর্তী একটি এলাকায় তাঁর জন্ম হয়৷ তুরস্কের পূর্ব প্রান্তে গ্রিসের নিকটবর্তী ইজমির শহরে শিক্ষা লাভ করে৷ শিক্ষাকালীন মস্তিষ্কপ্রসূত রোগের কারণে পাগল হয়ে যায়৷ দুই বছর চিকিৎসাধীন থাকার পরে সুস্থতা লাভ করে৷ এরপর দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে বক্তৃতাকে নিজের পেশা বানায়৷ বক্তৃতার মাধ্যমে গুলেন তুরস্কে এতোটাই প্রভাব ফেলে, দূরদূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর বয়ান- বক্তব্য শুনতে ছুটে আসতো৷ এরপর এক সময় জাগতিক শিক্ষায় পূর্ণ মনোনিবেশ করেন৷ ইস্তাম্বুলে ফাতেহ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন৷ তুরস্কের বড় বড় সম্পদশালীগণ তাঁকে ভরপুর সহায়তা করে৷ কিন্তু তিনি এক সময় আমেরিকা ও ইসরাইলের গোপন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন৷ আমেরিকার সহায়তায় একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার জমা করতে সক্ষম হন৷

এতোদ সত্ত্বেও ফাতহুল্লাহ গুলেনের ব্যাপারটি অনেকের কাছেই সন্দেহপূর্ণ রয়ে যায়৷ কিন্তু তিনি এতো বড় স্কলার ও তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়েও কেনো আজ পর্যন্ত কখনোই ইসরাইলের বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি? কেনোইবা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে একটি কথাও বলেননি? উল্টো মিসরে ইখওয়ানের উপর সিসির গণহত্যাকেও তিনি যথার্থ বলেছেন! গুলেন স্বয়ং হামাসের বিরুদ্ধেও বলেছেন৷ হামাসের উপর অযাচিৎ মিথ্যারোপ করেছেন৷ এর সাথে সাথে তুরস্কে মুসলিমবিদ্বেষী যতোগুলো গোপন সংগঠন আছে, তাদের সাথে গুলেনের গোপন আঁতাতেরও প্রমাণ রয়েছে৷ এতোসব কুচক্রের ফলে তুর্কি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে চাইলে তিনি কেনোই বা পালিয়ে

আমেরিকায় আশ্রয় নেন? নিজস্ব সিকিউরিটিতে বিশেষ খাদেমদের নিয়ে মুসলিম বিরোধি বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে আলাপও করেছেন তিনি।

মোটকথা, গুলেন এক সময় শত্রুদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। এমনকি তাঁর দলের লোকেরাও একে একে তাঁর থেকে সরে আসতে থাকে।

গুলেনের প্রসিদ্ধি মূলত সমগ্র তুরস্কে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুল, কলেজের মাধ্যমেই হয়। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই দ্বীনি শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি তুর্কি ভাষাও শেখানো হয় না। গুলেন নিজের ভক্তদের সামনে অনেক আজগুবি দাবিও করেছে। যেমন, সে নাকি আসমানে সকল ওলি, বুজুর্গদের ইমামতি করেছে।

কিন্তু ধীরে ধীরে তার প্রভাব ও ভক্তদের সংখ্যা কমতে থাকে। এমনকি তার প্রতিষ্ঠিত এশিয়ান ব্যাংকও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ যা তুরস্কের প্রতিটি শহর- গ্রামে বিদ্যমান ছিলো। আমেরিকার সাথে গুলেনের সম্পর্কের গভীরতা এ ঘটনা থেকে আন্দাজ হয়,

তুরস্ক ফিলিস্তিনিদের সাহায্যার্থে রসদভর্তি জাহাজ পাঠালে ইসরাইল তুরস্কের জাহজসহ তুর্কি নাবিকদেরকে শহিদ করে দেয়। এতে তুরস্ক জাতিসংঘে বিচার দাঁড় করালে ইসরাইল আমেরিকার আশ্রয় নেয়। আর আমেরিকা গুলেনের মাধ্যমে সুকৌশলে মামলা খারেজ করে দেয়। এভাবে গুলেন কখনোই ইসরাইলের নিন্দা তো দূরের কথা; বরং তাদের পক্ষপাতিত্ব করে ফিলিস্তিনের মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের নেতাদের তিরস্কার করেছে।

ইস্তাম্বুল শহর

আল ইত্তেহাদুল আলামির পক্ষ থেকে আয়োজিত আমাদের সেই কনফারেন্স মূলত ২০ আগস্ট ২০১৪ সনে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয়। তখন গাজা ইসরাইলের আক্রমণে বিধ্বস্ত। সিরিয়ায় বাশার আল আসাদকর্তৃক সাধারণ মুসলিম জনতা ও মুজাহিদিনের উপর বোমা

বর্ষণ, মিসরে সিসি নামের নতুন ফেরআউনের সবেমাত্র মসনদে বসা, ইরাকে নুরি মালেকির ধ্বংসযজ্ঞ; মুসলিমদের এমন করুণ মুহূর্তেই বিশ্ব মুসলিম চিন্তাবিদগণ ইস্তাম্বুলে একত্রিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত পরিপাটি আর সৌন্দর্যে ভরপুর পুরা ইস্তাম্বুল শহর। রাস্তার পাশে বিভিন্ন রকমের গাছের সারি আর ফুল গাছের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য যে কারো মন কেড়ে নিবে। উন্নত রুচিশীলতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় সম্পূর্ণ শহর বিশেষকরে এশিয়া অংশ শহরায়নের জন্য এক চমৎকার নমুনা বলে মনে করি। এশিয়া অংশ অধিক পরিপাটি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ইস্তাম্বুলের মূল ও পুরাতন অংশ ইউরোপে পড়েছে। পরবর্তিতে আবাদি বেড়ে গেলে এশিয়ার অংশটিকে পরিকল্পনামাফিক ঢেলে সাজানো হয়। প্রতিটি বাড়ির সামনে বাগিচার জন্য রাখা হয়েছে পৃথক জায়গা। যেখানে নানা রকমের ফুল দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে। কিছুদূর পরপরই আলীশান মসজিদ নজরে পড়ে। তুর্কির এই মসজিদগুলো শান- সৌকত আর সৌন্দর্যের কারুকার্যে পৃথিবীর অনন্য শিল্পায়নের পরিচয় বহন করছে। প্রতিটি মসজিদের এক পাশে রয়েছে নারীদের জন্যেও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা। আমাদের দেশে এ সিস্টেমটা নেই। এটা শতঃসিদ্ধ বিষয় যে, নারীদের জন্য ঘরে নামাজ পড়াই উত্তম। কিন্তু যে সব নারীরা প্রয়োজনের তাগিদে শপিং কিংবা বাহিরে বের হয়, নামাজের সময় ফুরিয়ে আসলে তারা কোথায় ফরজ আদায় করবে? বিষয়টা ভেবে দেখার মতো নয় কি?

সুলতান আব্দুল হামিদ আর আজকের আরব শাসকবৃন্দ

তুর্কিরা খুবই কর্মঠ এক জাতি। দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। চালচলন ও চেহারা- সুরতেও তাদের সেই ভালোবাসাই ফুটে উঠে। উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ প্রভাবশালী সুলতান আব্দুল হামিদ রহ.'র সেই ঐতিহাসিক ঘটনা এর বড় প্রমাণ। ইহুদিরা তাঁর কাছে অঢেল সম্পদের প্রস্তাব পেশ করে এর

পরিবর্তে ফিলিস্তিনে ইহুদি আবাদির অনুমতি চায়। কিন্তু সুলতান আব্দুল হামিদ জোয়াবে বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ফিলিস্তিনকে রক্তের বিনিময় ক্রয় করেছেন। আমাদের থেকেও নিতে চাইলে রক্তের বিনিময়েই নিতে হবে। ইহুদিদের দুতকে ডেকে তিনি বলেন, আমার শরীরের অঙ্গগুলোকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিলেও তা সহ্য করা আমার জন্যে সম্ভব হতে পারে; কিন্তু ফিলিস্তিনকে মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু আফসোস, তুর্কি সুলতানের সেই ঐতিহাসিক জোয়াবকে ভুলে আরবের পরবর্তি বাদশাহরা ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ করে দেয়। তারা ইসরাইলের কব্জাকে মেনে নেয়। এর সাথে সাথে মুসলিম স্বাধীনতাকামী দল হামাসকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয়।

আল ইত্তেহাদুল আলামির কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী আরব, অনারবের একজন আলেমও পাইনি, যিনি মিসর ও আরবের বর্তমান বাদশাহদের পক্ষে কথা বলেছেন। মনে হচ্ছিলো, উম্মতে মুসলিমার নির্ভরযোগ্য সকল কর্ণধারগণই এসব স্বার্থপর বাদশাহদেরকে ভেতরে ভেতরে ঘৃণা করেন। হিন্দুস্তানের যে সব মুষ্ঠিমেয় আলেমে দ্বীন এদের রাজত্বের বিরুদ্ধে বলছেন, তারা মূলত উম্মতের পক্ষ থেকে ফরজে কেফায়া আদায় করেছেন। নতুবা জালেম, পাপাচারী বাদশাহদের জুলুম ও পাপাচারে নিশ্চুপ থাকার দরুণ সকল উম্মত গুনাহগার সাব্যস্ত হতো! তাই উম্মতের উচিত সে সব আলেমদের পক্ষে থাকা। তাদেরকে সাহস দেয়া। এবং তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করা। মক্কা, মদিনার শাসনভার যাদের হাতে, তাদের সমালোচনা করা কখনোই আনন্দায়ক নয়। কিন্তু সত্য এ থেকেও অনেক উর্ধ্বের।

সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও তুরস্ক

সিরিয়ার অনেক আলেম কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। বাশার আল আসাদের প্রসঙ্গ এলে তারা জানালেন, রুশ ও চীন তাকে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করলেও ইরান যদি অস্ত্র ও সেনা দিয়ে হিজবুল্লাহর সাথে মিলে আসাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে না আসতো, তাহলে অনেক আগেই সে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হতো। সিরিয়ায় সুন্নি মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর পেছনে ইরানের হাত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বরং ইরানই সবচে' বড় অপরাধী। ইরানকে বিশ্বের মুসলিমগণ কখনোই ক্ষমা করবে না। রাজনৈতিক পলিসিতে স্বয়ং ইরানের অনেক বাসিন্দাও ইরান সরকারের ঘোর বিরোধী।

ইরাকের অনেক আলেমের সাথে 'দায়েশ' নিয়ে কথা হয়। আমি প্রথমে দায়েশ নিয়ে দ্বিধায় ভুগতাম। সে দ্বিধা কাটাতে ইরাকের আলমদের সাথে মতবিনিময় করি। তাতে মনে হয়েছে, দায়েশ নিয়ে স্বয়ং ইরাকিদের মধ্যেই মতপার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ইরাকি এক আলেমের সাথে কথা হলো। তিনি দায়েশের সমর্থক। বলছিলেন, এটা কেমন কথা যে, গতো তিন বছরে ইরাকের নুরি মালেকি হাজার, হাজার সুন্নিকে হত্যা করলো অথচ তা নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু দায়েশের এক দু' টি কাজে তারা মিডিয়া জগতে তোলপাড় শুরু করেছে! নুরি ইরাকের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে আহলুস সুন্নাহর সুন্নিদেরকে হটিয়ে দিয়েছে। দায়েশ না হলে সুন্নিদের উপর জুলুমের এই ধারা চলতেই থাকতো।

ইরাকি আরেক আলেমের কাছে এ কথাগুলো পেশ করলে তিনি বললেন, আমি কুর্দি। কুর্দিস্তানের স্বাধীনতাই আমার কাম্য। তাই এটা আমি কখনোই চাইবো না, কুর্দিস্তানকে কব্জা করে তেলের শক্তিটা দায়েশের হাতে চলে যাক।

সিরিয়ার প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ ড. খালেদ হিন্দাভী যিনি আমাদের নদওয়ার "রাবেতা আদাবে ইসলামি আলমি" ' র- ও সদস্য। তিনি বললেন, সিরিয়ার মুজাহিদদের সাথে আমার মাঝে মাঝেই দেখা সাক্ষাত হয়। কিন্তু দায়েশ তাদের থেকে ভিন্ন। দায়েশের মাঝে ঐসব গুণই পাওয়া যায়, যা ইসলামের শুরু জামানায় খাওয়ারেজদের মাঝে পাওয়া যেতো। খাওয়ারেজরা গুনাহে কবিরা করাকে কুফর বলে থাকে। আর গুনাহগারকে কাফের। দায়েশও তেমনি নামাজ পরিত্যাগকারীদের অতি সহজভাবেই গুলি করে হত্যা করে!

মোটকথা, দায়েশের ব্যাপারে আলেমদের মতামত বিভিন্ন রকমের। তবে, এটা বাস্তবতা যে, দায়েশ উগ্রপন্থী না হলে সম্পূর্ণ ইরাকে তাদের করায়ত্ব বিস্তার করা সহজেই সম্ভব হতো। কারণ, সিরিয়ার মুজাহিদগণের সমর্থন আর জিহাদের স্পৃহাধারণকারী হাজারো সুন্নি মুসলিম জনতা তাদের দলে এসে ভিড় জমাতো। হায়, তারা যদি নিজেদের ভুল ও বিশ্বাসগুলো সংশোধন করে নিতো!

আমাদের আল ইত্তেহাদুল আলামিও দায়েশের খেলাফতের স্বীকৃতি দেয়নি। তবে এটাও চির সত্য, ইরান ও আমেরিকা মিলে দায়েশসহ অন্যান্য জিহাদি গ্রুপের বিরোধিতা করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, তুরস্কের সীমান্তবর্তী কুর্দিস্তান, সিরিয়া ও ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে সুন্নিদের দাপট কমিয়ে শিয়া কিংবা আমেরিকার পা চাটাদের ষড়যন্ত্রমূলক নাপাক হস্ত প্রসারিত করা! এবং ধীরে ধীরে এর মাধ্যমে সুন্নিপন্থী তুরস্কের প্রভাব কমিয়ে আনা। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে!

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেনো মুসলিম বিশ্বকে শত্রুদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ও শত্রুতা থেকে রক্ষা করেন! ইসলামি

চেতনাধারী বীরদের মাধ্যমে আবার খেলাফতে নববিয়্যার কালেমাখচিত কালো পতাকা আকাশে উড্ডীন করেন!! আমীন!

এ জয় গনতন্ত্রের নয়, বরং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির

উরিয়া মাকবুল জান

(মূল প্রবন্ধটি উর্দু ভাষায় লিখিত৷ পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেম মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর তাঁর কিতাব "বসফরাস কে কিনারে" ' র মাঝে প্রবন্ধটি সংযুক্ত করেছেন৷ বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে অনুবাদ করে পেশ করা হচ্ছে৷)

এ জয় গনতন্ত্রের নয়, বরং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির

সার্কাসে দু' ধরণের এক্টর থাকে৷ এক, যে পূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞার সাথে নায়কের অভিনয়ে এক্টিং করে৷ দুই, নায়কের পরে এক ব্যক্তি আসে৷ যে নায়কের গাম্ভীর্যপূর্ণ এক্টিং করতে পারে না৷ অদ্ভুত ধরণের আকৃতিতে সেজে আসে৷ কখনো মুখে চুন মেখে পাগলের মতো পোষাক পরে স্টেজে উঠে৷ নানা কায়দায় বাজে রকমের ভঙ্গিতে মানুষকে হাসিয়ে তোলার চেষ্টা করে৷ এ জানে, নিজের দক্ষতায় সে চাইলেও নায়কের ভান করে সফল হতে পারবে না৷ তাই হাসি- মজাকেই নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চায়৷

কিছু দিন পূর্বে রজব তৈয়ব এ্যারদোগানের খেলাফ সেনাবাহিনির ক্ষুদ্র একটি অংশ বিদ্রোহের অপচেষ্টা করে৷ ফলে এ্যারদোগানের কয়েক লাইনের একটি টুইটে তুরস্কের জনগণ রাস্তায় নেমে পড়ে৷ ট্যাঙ্কের সামনে শুয়ে পড়ে৷ এভাবেই হাজার হাজার জনগণ সেনাবাহিনির সামনে দেয়াল হয়ে যায়৷ নিরস্ত্র জনগণের সামনে পরাজিত হয় গোলাবারুদ আর রাইফেলে সজ্জিত শক্তিশালী সেনাবাহিনি৷

এদিকে তুর্কি জনগণের এ ভালোবাসাকে পুঁজি করে নিজেদের মতাদর্শের দলিল বানিয়ে তথাকথিত কিছু পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণও সুযোগে বলে বেড়াচ্ছে, জনগণই রাজনীতি ও গণতন্ত্রের রক্ষক! জনগণ সরকারের পক্ষে হলে গণতন্ত্রের জয় হবেই!

মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রের বুলি আওড়িয়ে স্বৈরতন্ত্রের রুপকে জনগণের স্মৃতি থেকে কখনোই ভুলানো সম্ভব নয়৷ মুখে মুখে মাধুর্যের ছোঁয়ায় ওদের চতুরতা ও ধূর্ততাময় নাস্তিক্যবাদী রাজনীতির হিড়িক দেখে পাকিস্তানের মুসলিম জনগণের স্মৃতিপটে

সার্কাসের সেই নোংরা, পাগল এক্টরের কথাই ভেসে উঠে। নীরবে একাকি বসে এরা কখনো কি ভেবেছে, এদের ও তৈয়ব এ্যারদোগানের মাঝে পার্থক্যটা কোথায়? দেশের বাইরে থেকে টেলিফোনে দেয়া যার একটি মেসেজে তুরস্কের জনগণ ময়দানে নেমে আসে! যার প্রতিটি সফলতায় মানুষেরা নিজের পটেকের পয়সা দিয়ে মিষ্টি বিতরণ করে!

ওসব বুদ্ধিজীবীদের থুবড়ো বুলি কোথায় ছিলো; যখন রাতভর মিডিয়ার বিশ্ব সন্ত্রাসীরা টুইটার, ফেসবুক, টিভি চ্যানেলগুলোতে এ্যারদোগানের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে? তুর্কির নবাগত ইসলামি বসন্তকে সহ্য করতে না পেরে যারা সেকুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতা) ও লেবারিজম (উদারপন্থা, মুক্তচিন্তা)' র ধোঁয়া উড়ায়?

পাকিস্তানের সেকুলার বুদ্ধিজীবীগণও তাদের মনিবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। পশ্চিমাদের পা চেটে চেটে তারাও বলছিলো, আজ তো এ্যারদোগানের ইসলামপন্থী ক্ষমতার সূর্যটা চিরতরে ডুবেই যাবে! কিন্তু আল্লাহর কৃপায় তাদের সকল ' মনোবাসনা' ধুলায় উড়ে গেছে। জয় হয়েছে এ্যারদোগানের। জয় হয়েছে এ্যারদোগানের ইসলামের! তখন পশ্চিমা মিডিয়াগ্রুপ ও তাদের চেলাচামুণ্ডগুলো কতোটা আক্ষেপ ও আফসোস করছিলো তা অনুমান করাটাও কঠিন।

বৃটেনের প্রসিদ্ধ পত্রিকা টেলিগ্রাফ খবর দিচ্ছিলো,

The Army Sees Itself As The Guardian of Turkey's Secular Consitution

(তুরস্কের সেনাবাহিনিই তাদের গণতন্ত্রের রক্ষক)

অর্থাৎ, পার্লামেন্ট নয়, সেনাবাহিনিই আইনের রক্ষক ও নির্ধারক।

সেনাবিদ্রোহ শুরু হলে নিউইয়র্ক টাইমস সেনাবাহিনির পক্ষ হয়ে জনগণের জন্য শুভাকাঙ্খীর বেশে খবর প্রচার করতে থাকে, Look At Erdogan, Controvesial Rule In Turky

সুযোগ বুঝে বিশ্বব্যাপী ইহুদিবাদী সংবাদ মাধ্যমগুলো এ্যারদোগানের বিরুদ্ধে নানা রকমের কুপ্রচারণা চালাতে থাকে। ডেইলি বাইটের এক হেডলাইন ছিলো,
Erdogan Reportedly Denied Assylum In Germany, Now Headed to London
মানে, জার্মানি এ্যারদোগানকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাই এ্যারদোগান এখন লন্ডন অভিমূখি রওনা করছে!

ফক্স নিউস তো স্পষ্টই বলছিলো,
Erdogan Is Clearly A Threat To Turkish Democracy And Secularism
মানে, এ্যারদোগান তুরস্কের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য একটি স্পষ্ট বিপদ।

ফক্স নিউসকে পশ্চিমাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। সেদিন তারা সেনাবিদ্রোহের পর্যালোচনার জন্য কর্নেল পিটার র‍্যাল্ফকে ডেকে আনে। পিটার র‍্যাল্ফ সেই ব্যক্তি যে ২০০৫ এ পেন্টাগনের কোনো এক জর্নালে একটি কলাম লিখেছিলো, যাতে পুরা মুসলিম বিশ্বের নতুন নকশা পেশ করেছিলো সে! এই কর্নেল তো আরো স্পষ্ট করে বলে,
If the coup succeeds, Islamists loose and we win
মানে, এই বিদ্রোহ সফল হলে ইসলামপন্থীরা হেরে যাবে, এবং জিতে যাবো আমরা।

রাশিয়ান পত্রিকা স্পুটনিক যেনো খুশির জোয়ারে ভাসছিলো। সোশ্যাল মিডিয়ায় তুর্কি জনগণের পিক আপলোড করে নির্লজ্জ

মিথ্যা ক্যাপশন দিচ্ছিলো, সেনাবিদ্রোহ হওয়ায় তুর্কি জনতার উচ্ছ্বাস!

আফসোস, পাকিস্তানের স্যাকুলার মিডিয়ারাও নিজেদের মনিব পশ্চিমাদের সুরে তাল মিলিয়ে এ্যারদোগানের ইসলামের বিপক্ষে আওয়াজ তুলছিলো! রাতভর নির্ঘুম থেকে ওরা এ্যারদোগানের পরাজয়ের খবরটা শুনতে উদগ্রীব হয়ে বসেছিলো। কিন্তু আল্লাহর ফজলে বিদ্রোহ দমন হলে ওরা যে আফসোসে পুড়ে জ্বলছিলো, তা হয়ত ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এর থেকেও নির্লজ্জ চতুরতার কথা হলো, এই আফসোসকারীরাই এ্যারদোগানের সফলতার পরে সুর পাল্টিয়ে বলে বেড়াচ্ছিলো, ' তুর্কিতে গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। তুর্কি আরেকবার প্রমাণ করেছে, জনগণই গণতন্ত্রের মূল!'

বাস্তবেই কি তা গণতন্ত্রের জয় ছিলো? না উন্নতির ধাঁচে দেশকে এগিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলামাইজেশনের যে দৃষ্টিভঙ্গি এ্যারদোগান ধারণ করেন, সে দৃষ্টিভঙ্গিরই জয় ছিলো? এমন একটি রাষ্ট্র যেখান থেকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে ইসলামি খেলাফতকে ধ্বংস করে কামাল আতাতুর্ক স্যাকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করেছে। তুর্কি জাতীয় পোষাক পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে প্যান্ট, শার্ট আর নগ্ন পোষাক পরা বাধ্য করেছে। আরবি অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষর জারি করেছে। আজান, খুতবায় পাবন্দি আরোপ করেছে। জুলুম এতোটাই চলছিলো, কোনো এক সময় আরবেকান পার্লামেন্টে আরবিতে আজান দিলে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। তখন একে একে সাতজন পার্লামেন্ট সদস্য শাহাদতের অমীয় সূধা পান করেন সেই একটি আজান পুরা করতে গিয়ে! তুর্কির মুসলিম জনগণ তবুও হতাশ হয়নি। জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই তখন জালাল বাবর ও আদনান মেন্দারিস মন্ত্রিত্বের মসনদে বসেন। কিন্তু সেনাবাহিনি প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারিসকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে এবং

তাঁকে ফাঁসি দেয়! আর জালাল বাবরকে যাবৎ জীবন কারাগারে নিক্ষেপ করে।

একশো বছরের স্যাকুলারিজম এবং আমেরিকার মদদপুষ্ট সেনাবাহিনির উপস্থিতি স্বত্ত্বেও রজব তৈয়ব এ্যারদোগান তুর্কি জনগণের হৃদয়ে ইসলামের ভালোবাসা বদ্ধমূল করতে সক্ষম হয়েছেন। এই জন্যই এ্যারদোগান পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তার কারণ। তারা ভালো করেই বুঝেছে, এ্যারদোগানের এসব পদক্ষেপ তুর্কি সমাজকে একদিন ইসলামি সমাজে পরিণত করবে।

সমগ্র তুরস্কে মসজিদ, মাদ্রাসাগুলো বিরান হয়ে যাচ্ছিলো। এ্যারদোগান সেগুলোকে শুধু আবাদই করেননি; বরং নির্মাণ করেছেন হাজারো মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০০২ থেকে ২০০3 মাত্র দু' বছরের মধ্যে ১৭ হাজার নতুন মসজিদ তৈরি করেছেন। হিজাব পরা নিষিদ্ধ ছিলো, এ্যারদোগান সে নিষেধ তুলে নেন। ২০১৫' র নভেম্বরে বিশ্ব মিডিয়ায় খবর প্রচারিত হয়, তুরস্কের এক নারী জজ হিজাব পরে মামলা পরিচালনা করেছেন। আতাতুর্ক সকল মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে স্কুল বানিয়েছিলো, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষা দেওয়া হতো। এরপর এ্যারদোগানই প্রথম সরকার, যিনি স্কুলগুলোর সিলেবাস সংস্করণ করে ধর্মশিক্ষাকে আবশ্যক করেছেন। ক্ষমতার প্রথম দিকে সমস্ত স্কুলে মাত্র ৬৫ হাজারা ছাত্র পড়াশোনা করতো, এ্যারদোগানের কর্মকুশলতায় আজ সেখানে ১০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী নিয়মিত আসা- যাওয়া করছে। আতাতুর্কের যুগে কুরআন শিক্ষায় পাবন্দি ছিলো, এ্যারদোগান এসে কুরআনে কারিমের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

আতাতুর্কের শাসনামলে শিশুদের জন্য বারো বছরের পূর্বে কুরআন শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিলো। এ্যারদোগান সে নিষেধ তুলে নেন। স্যাকুলারদের উদ্দেশ্য ছিলো, একটি শিশুকে জীবনের প্রথম এক

যুগ তথা বারোটি বছর কুরআন থেকে দূরে রাখলে পরবর্তিতে আর কোনো দিনই তারা কুরআনের দিকে চেয়েও দেখবে না। বারো বছর পর কুরআন ধরলেও তা পড়বে সমালোচনার দৃষ্টিতে! নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা!

ইউরোপের হৃৎপিণ্ডে থেকেও এ্যারদোগান ২০১৩ তে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে মদের দোকান এবং মদের এ্যাড দেওয়া নিষিদ্ধের আইন জারি করেন। রাষ্ট্রব্যাপী সুদি ব্যাংকের পরিবর্তে ইসলামি ব্যাংকের প্রচলন ঘটান।

যদিও এসব পদক্ষেপ ইসলামি নেজামের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। পরীপূর্ণ ইসলামি ব্যবস্থা নয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও পশ্চিমারা জানে, এ্যারদোগানের এগুলো অব্যাহত থাকলে একদিন না একদিন তুরস্কে পুনরায় ইসলামি খেলাফতের নতুন চাঁদ উদয় হবেই। তাই ওদের সকল মাথাব্যথা এ্যারদোগানকে ঘিরেই। পশ্চিমারা ভালো করেই টের পেয়েছে, তুর্কি জনগণ গণতন্ত্র রক্ষার্থে নয়; বরং এ্যারদোগানের ইসলামের টানেই সেদিন মাঠে নেমেছিলো। নতুবা ইতিপূর্বেও কয়েকবার সেনাবিদ্রোহ ঘটেছে। তখন জনগণ রাষ্ট্র ও রাজত্বের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছিলো! কিন্তু এ্যারদোগানের ধর্মপ্রেম তুর্কি জনগণের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। এরই পরশে তারা তেজোদীপ্ত হয়ে উড়িয়ে দিয়েছে সকল ষড়যন্ত্র।

পশ্চিমা সভ্যতা এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি এ্যারদোগানের বার্তা

মূল
মাওলানা নাদীমুর রশীদ

(মূল প্রবন্ধটি উর্দু ভাষায়। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর তাঁর কিতাব "বসফরাস কে কিনারে" ' র মাঝে প্রবন্ধটি সংযুক্ত করেছেন। সেখান থেকেই অনুবাদ পেশ করছি।)

পশ্চিমা সভ্যতা এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি এ্যারদোগানের বার্তা

কিছু দিন পূর্বে তুর্কি প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যিব এ্যারদোগান বলেছেন, নারী- পুরুষ সমান হতে পারে না। এ্যারদোগান মূলত তাঁর কথায় ইসলামকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এ্যারদোগান বলেন, নারী- পুরুষ বরাবর হতে পারে না। কারণ, দু' জাতির মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই পার্থক্য রয়েছে।

ইস্তাম্বুলে ' নারীর প্রতি সুবিচার ও নারী অধিকার' শীর্ষক এক কনফারেন্সের স্টেজে এ্যারদোগান নারীবাদীদের বিরুদ্ধাচারণে এসব কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, নারী- পুরুষের মধ্যকার সৃষ্টিগত পার্থক্যের দাবি এটাই যে, দু' জাতি দু' ধরণের কাজ আঞ্জাম দিবে। প্রত্যেকের কাজ ও ধরণ ভিন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের ধর্ম ইসলাম নারীদেরকে মায়ের মর্যাদা দিয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে এমন যে কেউই এর মর্ম সহজেই বুঝতে পারে। তবে, অনেকে বিষয়টাকে সহজ না করে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তালগোল পাকানোর চেষ্টা করে।

এ্যারদোগান বলেন, নারীবাদীদেরকে আপনি এগুলো বুঝাতে পারবেন না। কারণ, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কী জিনিস, তা ওরা জানেই না। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, আমি মায়ের পা চুমা খেতাম। কারণ, আমার মনে হতো, আমি যেনো জান্নাতি খুশবু পাচ্ছি। মা লজ্জাবনত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

তুর্কি এই বীর যথার্থই বলেছেন। তাঁর এ বক্তব্য মূলত প্রতিটি মুমিন হৃদয়ের অভিব্যক্তি। এ থেকে তাঁর সাহসিকতা, বিরত্ব, সত্যবাদীতা ও ঈমানি গায়রতই প্রকাশ পেয়েছে। এটা কতো বড় সাহসিকতা তা বুঝানো অনেক কঠিন। একটু ভেবে দেখেছেন

কি, নারী- পুরুষ সমান নয়, এ ধরণের কথা এ্যারদোগানের মতো একজন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে বের হওয়ার পরিণাম কী হতে পারে? এটা এমন এক মতাদর্শ, যে কারণে ক্ষমতাও হাতছাড়া হতে পারে! জী, এমনটি হয়েছেও! ইউরোপের হিউম্যান রাইটস (মানবাধিকার) কোর্ট "ইউরোপিয়ান কোর্ট ওফ হিউম্যান রাইটস"- এ মামলা দায়ের করলে এ্যারদোগানের ক্ষমতা হারাবারও ভয় রয়েছে৷ যেমনটি নাজমুদ্দীন আরবেকানের ক্ষেত্রে হয়েছে৷

নারী, পুরুষের পার্থক্যের বর্ণনা, এটা যে শুধু মানবাধিকারের ধ্বজাধারী কর্তৃক বিশ্ব রোলের বিরুদ্ধাচরণ তাইই নয়; বরং ধর্মবিরোধি বিশ্ব তাগুতের বিপক্ষে নীরব, পরোক্ষ যুদ্ধের ঘোষণার নামান্তর৷ কারণ, বিশ্ব মানবাধিকারের কলকব্জা ও চাবিকাঠি জাতিসংঘের হাতে৷ তাই পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের জন্য এর রোল মেনে নেয়া আইনত আবশ্যক৷ যে তা মানবে না, বিশ্বশক্তিগুলো তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজাবে৷ বর্তমান পরিস্থিতি এর স্পষ্ট সাক্ষি৷ ব্যক্তি ও জনসাধারণ থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান, যে কেউ পশ্চিমা রোল ও সভ্যতা মেনে নিবে, দুনিয়ার সকল আরাম- আয়েশ তার জন্য উম্মুক্ত করা হবে৷ আর যে মানবে না, তার উপর নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করে পৃথিবীটা সংকীর্ণ করা হবে, এটাই হলো পশ্চিমাদের বাস্তব বীষধর নীতি৷

নারী অধিকার, মানবাধিকার নামক বিভিন্ন অধিকারের বুলি আওড়িয়ে ধর্মকে ওরা অবজ্ঞা করে যায়৷ রাষ্ট্রের ভেতরে বিশেষকরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে শরিয়ার প্রভাব মুছে দিতে ধর্মকে ওরা ব্যক্তিবিশেষের মাঝে আবদ্ধ রাখতে চায়৷ তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক সহ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই ধর্মকে উপেক্ষা করা হয়েছে৷ তাই তো হিউম্যান রাইটসের দাবি হলো, আজকের পৃথিবীতে ধর্মের উপর ভিত্তি করে কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা

করা যাবে না। তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওদের কথা হলো, নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি যতো নিম্ন ও নিকৃষ্টই হোক না কেন; এর উপরই ভরসা করো। ব্যক্তিস্বত্তা ও প্রবৃত্তি ব্যতীত সকল কিছুর প্রতি - তা যতোই উৎকৃষ্ট হোক না কেন- ঈমান, আকিদা ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করো!

মোটকথা মানবাধিকারের শ্লোগানে ওরা অন্য সকল ধর্ম ও মাজহাবকে ভুলিয়ে এক ধর্ম ও বিশ্বাসের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। যে ধর্মের মূল হলো, সকল ক্ষেত্রে কথা, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, এবং নারী- পুরুষ ও চোর- পুলিশের মাঝে সমতা আর ব্যক্তি স্বার্থের উন্নতি। রজব তাইয়্যেব এ্যারদোগান নারী- পুরুষের মধ্যকার সমতার পরিবর্তে পার্থক্যের কথা বলে মূলত পশ্চিমা বিশ্বের এক মূল বিশ্বাসেরই বিরোধিতা করেছেন।

তিউনিসিয়ার ' নাহযা ইসলামিয়া' পার্টির প্রধান রাশেদ ঘানুসীও ইসলামি বৈপ্লিক নেযামের কথা বলেছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধেও বাকস্বাধীনতা ও স্বেচ্ছারিতা এবং মানবাধিকার বিরোধিতার মতো বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়। অথচ তিনি নিজেও অনেকটা স্বাধীনচেতা ও মুক্তচিন্তার পক্ষে বলতেন। নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, জনগণের বিশ্বাস ও চালচলন নিয়ে সরকারের মাথা ঘামানো উচিৎ নয়। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সমুদ্রের বিচগুলোতে শর্টকার্ট পোষাক এবং মদ- জোয়ার আড্ডায় পাবন্দি আরোপ করার বিষয়ে আমরা এখনো ভাবিনি। তবে, তাঁর মতাদর্শ ছিলো এমন, আমরা জনগণকে এমনভাবে বুঝাবো যে, তারা নিজেরাই এ ধরণের পাপাচার করবে না। তবে, জনগণের উপর কোনো কিছুই চাপিয়ে দেয়া হবে না। সকল কাজে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে।

রাশেদ ঘানুসী এতো স্বাধীনচেতা হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্ব তাঁর মুখ থেকে ইসলামি নেযামের কথা সহ্য করতে পারেনি।

তিউনিসিয়ার মিডিয়াগুলোকে উসকে দিয়ে পশ্চিমারা ঘানুসীর বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। কারণ, পশ্চিমাদের ধারণা ছিলো, ঘানুসী মুখে মুখে স্বাধীনচেতার কথা বললেও মনে প্রাণে এর ঘোর বিরোধি। তাই পশ্চিমারা নিজেদের মতাদর্শ বাঁচাতে তিনজন নারীকে তিউনিসিয়ায় পাঠায়। মার্গারেট ও পোলাইনকে ফ্রান্স থেকে। এবং জোসেফাইন মার্ককে জার্মানি থেকে।

নারী অধীকারের নামে এ তিন মহিলা মুষ্ঠিমেয় কিছু নারীকে সাথে নিয়ে বিক্ষোভ, সমাবেশ করে। উন্মুক্ত রোড, বাজারে তারা নিজেদের বুকের কাপড় খুলে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বিক্ষোভ করে। তিউনিসিয়ার পুলিশ এসব নির্লজ্জ বেহায়া মহিলাদেরকে গ্রেফতার করে। এবং চার মাসের জন্য জেলে নিক্ষেপ করে। পশ্চিমারা তখন তিউনিসিয়ার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নারী অধিকার বিরোধিতার অপবাদ দেয়। এবং ঘানুসীর ইসলামি হুকুমতের বিরুদ্ধে কঠিন বিক্ষোভ তৈরি করা হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘানুসী ২০১৩' র সেপ্টেম্বরে নতুন করে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নবনির্বাচনে পশ্চিমারা ঘানুসীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। কারণ, তিনি উলঙ্গ হয়ে বিক্ষোভকারী নারীদেরকে জেল খাটিয়ে নারী অধিকার লঙ্ঘন করেছিলেন!

পশ্চিমা বিশ্ব বাকস্বাধীনতা, নারী অধিকার আর ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে যখন কোনো কিছুই সহ্য করতে পারে না; সেই পশ্চিমাদের ইউরোপে বসে কতোটা মর্দে মোমিন হলে পূর্ণ সাহসিকতা ও ঈমানি চেতনা নিয়ে এ্যারদোগান মুখ খুলেছেন, তা সত্যিই মুসলিম চিন্তাবিদদের ভাবিয়ে তোলে!

এ্যারদোগান পশ্চিমা বিশ্বের মতাদর্শের বিরুদ্ধে এই প্রথমবারই বলেননি। এর পূর্বেও তুরস্কের এক সাংবাদিক দৈনিক পত্রিকাতে ইসলামের বিষোদগার করলে এ্যারদোগান তাকে সমুচিৎ জোয়াব দেন। সাংবাদিককে তিনি নির্লজ্জ, সাম্প্রদায়িক ও আতঙ্কবাদী

বলেছেন। এ্যারদোগান ধর্মবিদ্বেষীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাদের উচিৎ কখনো সীমালঙ্ঘন না করা। তখন এ্যারদোগানের খেলাফ বিশ্ব মিডিয়াগুলো সমালোচনার ঝড় তুলে দেয়। কিন্তু তিনি এসবের কোনো পরোয়া করেননি।

এ্যারদোগানের মতো তুরস্কের উপপ্রধানমন্ত্রী বুলন্দ অরিঙ্কও পশ্চিমা বিশ্বের কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না। ঈদুল ফিতরের দিনে এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, নারীদের জন্য লজ্জা ও পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এটা কোনো শাব্দিক ভূষণ নয়; বরং নারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অলঙ্কার। তাই প্রতিটি নারীকেই লজ্জাশীলা হওয়া চাই। নারীদের জন্যে পার্সোনাল ও পাবলিক লাইফের মধ্যকার পার্থক্য বুঝেই তবে চলাফেরা করা উচিত। কোনো নারীর জন্যেই পাবলিক প্ল্যাসে বসা, হাসাহাসি করা ও উন্মুক্ত চলাফেরা করা কখনোই কাম্য নয়।

বুলন্দের এই ভাষণেও কতিপয় নারীরা সড়কে এসে বিক্ষোভ করেছে। বুলন্দের প্রতিবাদ জানাতে নারী কর্মীরা নিজেদের পিকগুলো শোশ্যাল মিডিয়াতেও উন্মুক্তভাবে প্রচার করেছে!

একটি রাষ্ট্রের একজন জালেম বাদশাহর সামনে সত্য উচ্চারণ উত্তম জিহাদ হলে, বিশ্বময় অত্যাচারী পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে বলা কি জিহাদের অন্তর্ভূক্ত হবে না? যারা প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে বিশ্বের সকল সরকার, সাম্রাজ্য, মানুষ ও মানবসমাজকে নিজেদের দাসত্বে আবদ্ধ রেখেছে? এ্যারদোগান সরকার নিজের কথা ও কাজে বাস্তবেই মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমা দর্শন থেকে মুক্ত হওয়ার পয়গাম দিয়ে যাচ্ছেন। এ্যারদোগানের ভাষণ শুধু রাজনৈতিকই নয়, বরং নতুন শতাব্দীতে যেনো তাগুতের খেলাফ একটি মুসলিম সিংহের সাহসী গর্জন কিংবা একজন উসমানীয় মুজাহিদের জাগরণী হুঙ্কার। আচ্ছা, যে ব্যক্তি পৃথিবীর পরিস্থিতি জেনে বুঝেও বক্তৃতা-

ভাষণের মাধ্যমে নিজের মসনদকে বিপদে ঠেলে দেয়, তাঁর চেয়ে ঈমান ও গায়রতমান মুসলমান আর কে হতে পারে?

রাষ্ট্রের জন্য এ্যারদোগানের অবদান

মূল
মাওলানা আব্দুল মুনঈম ফায়েয

(মূল প্রবন্ধটি উর্দু ভাষায় লিখিত। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর তাঁর কিতাব "বসফরাস কে কিনারে" ' র মাঝে প্রবন্ধটি সংযুক্ত করেছেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে সেখান থেকেই মূলত অনুবাদ করে পেশ করা হচ্ছে।)

রাষ্ট্রের জন্য এ্যারদোগানের অবদান

তুরস্ক এখন তার হারানো ঐতিহ্যের দিকে ধাবমান। ইসলামি মানসিকতার তুর্কি কর্ণধারগণের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে তুরস্কের চারিদিক যেনো ইসলামি বসন্তের সবুজে সজীব হয়ে উঠছে। জনগণের হৃদয়ে সরকারের প্রতি ভালোবাসা বদ্ধমূল হলে, গোলা- বারুদ আর তোপ- কামান যে তাকে পরাজিত করতে পারে না, এ্যারদোগান তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এ্যারদোগান বিশ্বমোড়লদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়েছেন, ইসলামপন্থী সরকারগণ শুধু যে নেতৃত্বের যোগ্য তাই নয়, বরং এতোটাই সফলকাম যে, জনগণ তাদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা পশ্চিমাদের চিরাচরিত অভ্যাস। এ্যারদোগানের ক্ষেত্রেও ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তাই ওরা এ্যারদোগানের চরিত্র ও তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে বিভিন্ন সময় নানা অপবাদ ও মিথ্যারোপ করে। কিন্তু তুর্কি জনগণ তবুও কেনো এ্যারদোগানকে এতো ভালোবাসে? তবুও কেনো একজন রাষ্ট্রনায়কের জন্য জীবন উৎসর্গ করে? কেনোই বা তুর্কি লেখকগণ নিজেদের কালি ও কলমে এ্যারদোগানকে ফুটিয়ে তোলে? তাহলে কী সেই গুণ ও যোগ্যতা, যেগুলো তাঁকে অনন্য উচ্চতার শিখরের পৌঁছিয়েছে? আজ আমরা সেগুলোই বর্ণনা করবো......

অর্থনৈতিক পদক্ষেপ

আজকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক সমস্যাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থ না থাকলে মানুষকে আকৃষ্ট করাও অনেক কঠিন বিষয়। উন্নত বিশ্বের ঝকঝকে সব কিছু দেখে জনগণের

দৃষ্টিও তাই সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক উন্নতির দিকেই পড়ে। এ্যারদোগান সর্বপ্রথম সে দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন। মানুষের রুচি ও চরিত্র বুঝার চেষ্টা করেছেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে নানাবিধ অরাজগতা ও ষড়যন্ত্রের কবলে তুরস্কের অর্থনীতি সম্পূর্ণরুপে ভেঙ্গেই পড়েছিলো। অবনতির দিক থেকে তুরস্ক বিশ্বের ১১১তম অবস্থানে ছিলো। সেখান থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি করে মাত্র কয়েক বছরেই বিশ্বের ১৬ তম উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এর সম্পূর্ণ কীর্তিটাই এ্যারদোগানের। ২০১৩ তে তুরস্কের বাৎসরিক উৎপাদন ১১০০ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছে যায়। দশ বছর পূর্বে তুরস্কের জন প্রতি বাৎসরিক আয় ছিলো মাত্র তিন হাজার পাঁচশো ডলার। এখন তা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়ে এগারো হাজারে পৌঁছেছে, যা ফ্রান্সের পার্সেন্টিস আয় থেকেও অনেক বেশি। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে তুর্কি জনগণের মাসিক বেতনও ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু দিন পূর্বেও যেখানে একজন সাধারণ দিনমজুরের পারিশ্রমিক ছিলো ৩৪০ লীরা, আজ তা ৯৫০ থেকেও বেশি হয়ে গেছে। দিনমজুরের সংখ্যা এক সময় ৩৮ পার্সেন্ট ছিলো, এখন তা মাত্র ২ পার্সেন্টে এসে গেছে। এক সময় তুরস্কের বাজেট ঘাটতি ১৪৭ কোটি ছিলো, এখন তা কমে শুন্যের কোটায়। বিশ্ব ব্যাংকের কাছে ৩০০ মিলিয়ন ডলার থেকেও বেশি ঋণ ছিলো। এ্যারদোগানের সুকৌশলে তুরস্ক সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হয়ে যায়। সাথে সাথে বিশ্বব্যাংককে পাঁচ কোটি ডলার কর্জও দেয়। এবং বাড়তি ১০০ কোটি রিজার্ভ রাখতে সক্ষম হয়। যখন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র ঋণে জর্জরিত হচ্ছিলো, দারিদ্র্য বেড়ে চলছিলো, এ্যারদোগান সেই ইউরোপে থেকেও তুরস্ককে উন্নতির তুঙ্গে নিয়ে যান। দশ বছর পূর্বে তুরস্কের রপ্তানি ছিলো ১২৩ কোটি, আর এখন তা হয়েছে ১৫৩ কোটি ডলার। যা বিশ্বের ১৯০ রাষ্ট্রে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে আয় করা হয়েছে। গাড়ি, মোটরসহ

ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্র এশিয়া এবং ইউরোপেও ব্যাপক সারা জাগিয়েছে। আজ ইউরোপের বাজারে প্রায় ৩০ পার্সেন্ট ইলেক্ট্রনিক জিনিসপত্র তুরস্কেরই হয়ে থাকে। এভাবেই এ্যারদোগান তুরস্ককে উন্নত বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করতে শিখিয়েছে। এ্যারদোগান ঘোষণা করেছে, ২০২৩ সালে তুরস্ক অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং রাজনৈতিক পরাশক্তিতে পরিণত হবে!

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি

অর্থনৈতিক শক্তির পরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন সবচেয়ে গুরুত্ব বহন করে। যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষায় নিজস্ব সামর্থ্য অর্জন না হলে বহিঃশক্তির কাছে সর্বদা মাথা নীচু করেই বাঁচতে হয়। তাই এর গুরুত্ব বুঝে এ্যারদোগান তুরস্কের সমুদ্র, স্থল, আকাশ ও গোয়েন্দা, মোটকথা সকল বিভাগেই মনোনিবেশ করেন। এ্যারদোগানই প্রথমবারের মতো তুরস্কে নিজস্ব ট্যাঙ্ক তৈরি করেন। সমুদ্রপথের জন্য এ্যারদোগানই তুরস্কে সর্বপ্রথম ফ্রিগেট তৈরি করেন। এমনিভাবে ড্রোন বিমান, সামরিক স্যাটেলাইটসহ অসংখ্য যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে সক্ষম হন। বর্তমানে ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর ইউরোপের শীর্ষ বড় বিমানবন্দরগুলোর একটি গণ্য করা হয়। এ্যারদোগান প্রায় ৫০ টির মতো ইয়ারপোর্ট নির্মাণ করেন। দেশব্যাপী কয়েক লেনের প্রায় ১৯ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক তৈরি করেন। ফলশ্রুতিতে পুরা রাষ্ট্রে ট্রাফিক জ্যাম ৫০ পার্সেন্ট কমে যায়। গতো কয়েক বছরে তুরস্কের আকাশপথ বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ আকাশপথগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। দশ বছরে এ্যারদোগান সরকার দেশব্যাপী দুই কোটি ৭৭ হাজার বৃক্ষ রোপণ করে। বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। এ পরিকল্পনার আওতায় তুরস্কের এক তৃতীয়াংশ বসতি উপকৃত হচ্ছে। এ্যারদোগান তুরস্কে গ্রাম ও শহরের ৯৮ পার্সেন্ট এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ করে দেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন

শিক্ষাই একটি জাতির মেরুদণ্ড। সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি হলেও শিক্ষার নিজস্ব কোনো উন্নত মাধ্যম এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশপ্রেম, নৈতিকতার সিলেবাস না হলে রাষ্ট্র কখনোই পরাশক্তি হতে পারবে না। তাই এ্যারদোগান এর জন্য দেশব্যাপী ১২৫ টি নতুন ইউনিভার্সিটি, ১৮৯ স্কুল এবং ৫১০ টি হস্পিটাল তৈরি করেন। সরকারি স্কুলগুলোর সিলেবাসে ১৬৯ টিরও বেশি নতুন বিষয় সংযুক্ত করেন। এবং আইন জারি করেন, ২১ বছরের উপরে কোনো শিক্ষার্থী এসব স্কুলে এ্যাডমিশন নিতে পারবে না। ইউরোপ, আমেরিকায় উন্নতির জোয়ারে হাজার স্কুল, কলেজ বৃদ্ধির ফলে এ্যাডমিশন ও স্কলার ফি- ও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ্যারদোগান এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ্যারদোগান সকল স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে ফ্রী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এবং ঘোষণা করেন, স্টুডেন্টদের সব খরচ সরকার বহন করবে। এ্যারদোগান আশা ব্যক্ত করেন, ২০২৩ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যাপী তিন লাখ বিজ্ঞানী ও গবেষক তৈরি হবে। খুলবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন ভাতাও বৃদ্ধি করেন। ঘোষণা দেন, সাধারণ শিক্ষকদের বেতন একজন প্রফেশনাল ডাক্তারের সমান হবে। এ্যারদোগান নতুন টেকনোলজির জন্য প্রায় ৩৫ হাজার গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজনৈতিক সফলতা

নৈকিকতা, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা, সকল ক্ষেত্রে সমান তালে উন্নতি করেন এ্যারদোগান। ফলে তিনি জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নেন। এ্যারদোগানই ইতিহাসের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, নিরস্ত্র জনগণ যার পক্ষ হয়ে শক্তিশালী সেনাবিদ্রোহ ঠেকিয়ে দেয়। এ্যারদোগানের রাজনৈতিক কারনামাগুলোর একটি হলো, তিনি

সাইপ্রাসের দু'অংশেই কুর্দি বিদ্রোহীদের দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কুর্দিদের এ বিদ্রোহ বছরের পর বছর ধরে তুরস্কের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

এ্যারদোগান যুবকদেরকে দেশপ্রেম ও নৈতিকতা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই জন্য তিনি শিক্ষা সিলেবাসে দ্বীনি শিক্ষা আবশ্যক করা সহ নিজের বিভিন্ন কনফারেন্সে এবং বয়ান, বক্তৃতায় ইসলামের খলিফাগণ ও তুর্কির বিভিন্ন ইসলামি ব্যক্তিগণের আদর্শে উজ্জীবিত হতে উৎসাহিত করেন। শিশুদের প্রতি রয়েছে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি। টি ভি' র কোনো এক প্রগ্রামে বারো বছরের কিশোরীর সাথে তুরস্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংলাপ করেন। কিশোরীর চিন্তা- ভাবনা শুনে এ্যারদোগান তার খুব প্রশংসা করেন। তুরস্কের শিশু, কিশোরদেরকে তার মতো ভাবতে উপদেশ দেন। এভাবেই তিনি শিশু, কিশোর ও যুবকদেরকে সৎ ও সঠিক পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে যান।

এ্যারদোগানের বিচক্ষণতায় ইসরাইলের মতো পরাশক্তিও তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। এ্যারদোগান তখন ইসরাইলকে গাজা থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার শর্তারোপ করেন। শিমন পেরেজ[১৪]' র সাথে বিশ্ব অর্থনীতি বিষয়ক কনফারেন্সে এ্যারদোগান শুধু এ জন্যই তাকে ওয়াকআউট করেন যে, তখন ইসরাইল নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এ্যারদোগানই বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি বার্মার নিপিড়িত মুসলিমদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে সান্তনার বাণী শুনান। এবং বাঙলাদেশকে তাদের আশ্রয় দিতে বলেন। বার্মার মুসলিমদের জন্য এ্যারদোগানই বাঙলাদেশ সরকারকে কোটি কোটি টাকার সাহায্য প্রেরণ করেন।

---

[১৪] ইসরাইলের সাবেক প্রসিডেন্ট। প্রেসিডেন্সি কাল ২০০৭ - ১৪, জন্ম- ১৯২৩, মৃত্যু- ২০১৬

প্রায় নব্বই বছরের সেনা আধিপত্যের পর এ্যারদোগানই প্রথম সরকার, যিনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কুরআন ও হাদিস শিক্ষার অনুমতি দেন। নব্বই বছর যেখানে আতাতুর্কের ধর্মদ্রোহী শাসনব্যবস্থা চালু ছিলো, যেখানে শুধু ধর্মের কথা বলার কারণে প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেসকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে, এবং তাঁর পরে প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবেকানকেও যেখানে জেল খাটতে হয়েছে; এ্যারদোগান ধীরে ধীরে এর রঙ পরিবর্তন করে দ্বীনি শিক্ষা চালু করেন। সেনাবাহিনি, সংসদ সদস্য সকল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে ধর্মের ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

তৈয়ব এ্যারদোগান সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে স্কার্ফ পরার অনুমতি প্রদান করেন। আরব বিশ্ব যখন ভোগবিলাসের মোহে চৌদ্দ লাখ ডলারে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিস্টমাস ট্রি[১৫] (দেবদারু গাছ) তৈরি করে, এ্যারদোগান তখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় লাইটিংয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আঁকে।

---

[১৫] লোকদের ধারণা, হাজার হাজার বছর আগে উত্তর ইউরোপে প্রথম ক্রিসমাস ট্রি- র প্রথা শুরু হয়। সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক মনে করা হয় এই গাছকে। উত্তর ইউরোপের মানুষ বিশ্বাস করতেন, বাড়িতে চিরসবুজ এই গাছ লাগালে অশুভ শক্তি দূরে সরে যায়। সেখান থেকেই বড়দিনে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর প্রথা শুরু হয়। আর এখন তো বড়দিনে এই গাছের গায়ে আলোর মালার সঙ্গে খেলনা, চকোলেট, ঘণ্টা সবই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

বড়দিন বলতে যিশু খৃস্টের জন্মের সঙ্গে ক্রিসমাস ট্রি' র বিশ্বাসটি যুক্ত আছে। খ্রীস্টানদের ধারণা, যিশুর জন্মের পর যাঁরা তাঁর বাবা- মা জোসেফ ও মেরিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের বাড়ি এই চিরসবুজ ফার গাছ আলো দিয়ে সাজিয়ে দেন। সেই থেকে যিশুর জন্মদিনে এই গাছ আলোর মালায় সাজানোর প্রথা প্রচলিত। আরও বিশ্বাস রয়েছে, এই গাছ আদম ও ইভে (হাওয়া আ.)' র খেলার জন্য সর্বপ্রথম স্বর্গে পোঁতা হয়েছিল। ১৬শ শতকে আধুনিক ক্রিসমাস ট্রি প্রথম জার্মানিতে দেখা যায়। ১৮শ শতকে প্রায় গোটা বিশ্বেই ক্রিসমাস ট্রি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। (বিস্তারিত পড়ুন, উইকিপিডিয়া ইংলিশ- "Christmas tree"

এ্যারদোগান সাত বছর বয়সী দশ হাজার শিশু নিয়ে ইস্তাম্বুলের সড়কে সমাবেশ করেন, বাচ্চারা তখন বলছিলো, আমরা সাত বছরে পৌঁছে গেছি, এখন আমাদের নামাজ পড়তে হবে.......!

সেনাবিদ্রোহের মূল হোতা কে এই ফাতহুল্লাহ গুলেন?

মূল লেখকের নাম অপ্রকাশিত

(মূল প্রবন্ধটি উর্দু ভাষায় লিখিত। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর তাঁর কিতাব "বসফরাস কে কিনারে" ' র মাঝে প্রবন্ধটি সংযুক্ত করেছেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিকে লক্ষ করে এখানে সংযুক্ত করা হচ্ছে।)

সেনাবিদ্রোহের মূল হোতা কে এই ফাতহুল্লাহ গুলেন?

তুরস্কের এই সেনাবিদ্রোহের সূত্রপাত কয়েকদিনেই হয়নি। কিংবা মাত্র গুটিকতক ব্যক্তিকে প্রস্তুত করেই বিদ্রোহ সম্ভব হয়নি। বরং এর পেছনে একজন ব্যক্তির পুরা জীবনের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় তৈরি হাজারো লোকের কুচক্রের ফলই কাজ করেছে। যারা ছিলো তুরস্কের বড় বড় পোস্টে উপবিষ্ট। বিদ্রোহ সফল করতে বিশ্ব মিডিয়াগুলো যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার প্রথম দুই তিন ঘণ্টার উপদ্রবের বর্ণনা শুনলে যে কোনো ব্যক্তি বিষয়টা আঁচ করতে পারবে, ফাতহুল্লাহ গুলেনই এই বিদ্রোহের নেপথ্যে মূল ইন্ধন যোগানদাতা।[১৬]

---

[১৬] বিবিসির পক্ষপাত:

২০১৬'তে তুরস্কে সংঘটিত সেনাবিদ্রোহের আসল যোগানদাতা কে, এ নিয়ে বিশ্লেষকদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ বিশ্লেষকদের মতে ফাতহুল্লাহ গুলেনই এর মূল হোতা ও ইন্ধনদাতা।

তবে, গুলেনপন্থীদের অনেকে আবার এটা অস্বীকার করেন। বিবিসির ভাষ্য মতে, বিদ্রোহীরা নিজেদেরকে "মজলিসে সালাম ফিল ওয়াতান" (শান্তি কাউন্সিল)' র সদস্য বলে বেড়াতো। যা মূলত আতাতুর্কের বাণী সদৃশ। আতাতুর্ক বলে বেড়াতেন, আমরা দেশে শান্তি চাই এবং শান্তি চাই পুরা বিশ্বে। (সূত্র: বিবিসি আরবি, ১৭ জুলাই, ২০১৬)

সে হিসেবে আতাতুর্ক ও তাঁর অনুসারীরাই হয়ত মূল ইন্ধন যুগিয়েছে। যারা তুরস্ককে পুনরায় ইউরোপ, আমেরিকা ও ইসরাইলপন্থী রূপে ফিরিয়ে আনতে চায়।

তবে, বিবিসির এই প্রাধান্য দেওয়াটা অন্ধ পক্ষপাত ও তথ্য চুরি থেকে মুক্ত মনে হচ্ছে না। কারণ, অসংখ্য প্রমাণাদি স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, গুলেনই মূল ইন্ধনদাতা। একে তো, ইসরাইলের সাথে গুলেনের গোপন সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনকারীদের মধ্যে আধিকাংশের সাথে গুলেনের সরাসরি সম্পর্ক থাকা। এমন অনেক প্রমাণই বিবিসির ধারণাকে ভুল সাব্যস্ত করে।

ফাতহুল্লাহ গুলেন জন্মসূত্রে তুর্কি হলেও বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যের পেনসিলভেনিয়া[১৭] প্রদেশের সালজবুর্গ শহরে আমেরিকান ছত্রছায়ায় বসবাস করছেন। সেখানে তিনি দীর্ঘ ১৪০০ একর জমিন বিস্তৃত বিশাল আলীশান বাড়িতে অত্যন্ত শৌখিনতা ও বিলাসিতায় জীবন-যাপন করেন। তার বার্ষিক আয় এখন ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়।

গুলেন তুরস্কের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তি। কারো কারো জন্য তিনি মডেল হলেও তুরস্কের অধিকাংশ জনগণই তাকে দেশ ও জাতির গাদ্দার বলেই জানে। গুলেন তুরস্কের সর্বত্রই নিজের অনুসারীদের জাল বুনে রেখেছে। বিদ্রোহের পরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ থেকে তার হাজার, হাজার অনুসারীকে গ্রেফতার করা হয়। শুধু বিচার বিভাগ থেকেই ২৫০০ জন জজ গ্রেফতার হয়। গুলেন সমগ্র তুরস্কে তার মতাদর্শের এক আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। যে আন্দোলনের বাহ্যত নাম দিয়েছে 'জায়শুন নুর' এবং 'জুনুদুল হক'।শুধু তুরস্কই নয়; পাকিস্তান, বাঙলাদেশসহ বহির্বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই এর অনুসারীরা গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। যারা গুলেনকে একজন নবী না হলেও যুগের ইমাম তো অবশ্যই মনে করে থাকে।

লেখার জগতেও গুলেনের বিশাল হাত রয়েছে। তার লিখিত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৭০ টি। বিশ্বের ৩৫ টি ভাষায় এগুলোর অনুবাদ হয়েছে। এর মধ্যে এখনো পর্যন্ত ১৩ টি বইয়ের উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার বয়ান- বক্তৃতার অডিও, ভিডিও হাজার- হাজার ক্যাসেট রয়েছে। গুলেনের প্রভাব তুরস্কের সাধারণ জনগণ থেকে নিয়ে ক্ষমতার শিখরে প্রভাব ফেলেছে। এমনকি

---

[১৭] পেনসিলভেনিয়া, সরকারিভাবে কমনওয়েলথ অব পেনসিলভেনিয়া, উত্তর-পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য- আটলান্টিক, অ্যাপালাচিয়ান ও গ্রেট লেক অঞ্চলগুলির একটি রাজ্য। সূত্র: উইকিপিডিয়া বাঙলা।

উচ্চস্তরের অনেক কর্মকর্তার সাথে গুলেনের গোপন আলাপের কল রেকর্ডও ধরা পড়েছে।

সেনাবিদ্রোহের পর নতুন করে গুলেন আলোচনায় আসেন। তাই এই ব্যক্তির জীবনী নিয়ে কিছুটা পর্যালোচনা করা দরকার।

ফাতহুল্লা গুলেনের জীবনবৃত্তান্ত

গুলেন তুরস্কের করুচুক নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। যা এরজুরুম[১৮] (ارض روم) প্রদেশের ' হাসান দুর্গ' র একটি শহরতলি হিসেবে প্রসিদ্ধ। বছরের নয় মাসই যেখানে শীতের মৌসুম থাকে। প্রচণ্ড শীতের কারণে এখানে আবাদি অনেক কম।

গুলেনের পূর্বপুরুষগণ ঐতিহ্যবাহী আখলাত শহর থেকে এখানে হিজরত করেছেন। আখলাত[১৯] তুরস্কের বিটলিস প্রদেশের ছোটো একটি শহর। কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামের বংশধরগণও বিটলিস উপত্যকায় এসেছিলেন। শহরের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তারা দ্বীন প্রচার করেছেন। তাদের প্রভাবেই এই এলাকার মানুষেরা ধর্মপ্রাণ মুসলিম হয়ে ওঠে।

গুলেনের পিতা রামেজ আফেন্দি করুচুক এলাকার একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। সেখানেই মুহাম্মাদ ফাতহুল্লাহ গুলেন ১৯৪১ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। গুলেনের পরিবার খুবই ধার্মিক ছিলো। তার মা কামাল আতাতুর্কের শাসনামলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি কঠিন নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এলাকার নারীদের মাঝে দ্বীনি তালিম চালিয়ে যেতেন। কোনো প্রকার ভয়- ভীতির পরওয়া করতেন না।

---

[১৮] এরজরুম (ইংলিশে Erzurum) তুরস্কের পূর্ব আনাতোলিয়ার একটি শহর। এটি তুরস্কের একটি প্রদেশ। এরজুরুম শহর এই প্রদেশের বৃহত্তম সিটি এবং রাজধানী। সূত্র: উইকিপিডিয়া ইংলিশ।

[১৯] আখলাত পূর্ব তাতালিয়া অঞ্চলের তুরস্কের বিটলিস প্রদেশের একটি শহর ও জেলা। ১৯২৯- ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এটি ভ্যান প্রদেশের জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আখলাত শহরটি ভ্যান লেকের উত্তর- পশ্চিম তীরে অবস্থিত। সূত্র: উইকিপিডিয়া ইংলিশ।

গুলেনের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, তিনি চার বছর বয়সে তার মায়ের কাছে কুরআন মজিদ পড়তে শুরু করেন। মাত্র এক মাসেই নাকি পুরা কুরআন শরিফ নাজেরা খতম দিতে সক্ষম হন।

এলাকার প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু করেন। আরবি, ফারসি এবং প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা পিতার থেকেই নেন। পরবর্তিতে তার বাবা পরিবারসহ অন্য এলাকায় চলে যায়। গুলেন তখন ইজরুমের বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসায় পড়াশোনার সুযোগ পান।

রামেজ আফেন্দির আলেম- উলামা ও সুফি- দরবেশগণের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিলো। তাঁর বাড়িতে অনেক আলেম- উলামা আসতেন। পিতার কারণে গুলেনও বহু আলেম- উলামার সান্নিধ্যে ধন্য হন। গুলেন তাদের মাঝে শায়খ মুহাম্মাদ লুতফি আল ওরলি দ্বারা অনেক বেশি প্রভাবান্বিত হন। গুলেন জীবনভর যার কথা স্মরণ করে গেছেন। এবং তার নাম অত্যন্ত সম্মানের সহিত উচ্চারণ করেন। গুলেন স্বীকার করেন, তার সকল বিশ্বাস ও অনভূতি নাকি শায়খ থেকেই গ্রহণ করা। গুলেন বলেন, এক সময় আমি তাঁর প্রতিটি কথাকেই ঊর্ধ্ব জগতের ইলহাম মনে করতাম।

প্রথম জীবনে গুলেন যে সব ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, তাদের মাঝে অন্যতম হলেন সে যুগের বিখ্যাত ফকিহ আলেম উসমান বাকদাশ। পরবর্তিতে ইমাম সাঈদ নুরসি রহ.' র গ্রন্থাবলী গুলেনের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। গুলেন জীবনের দীর্ঘ সময় তুরস্কের এই বিখ্যাত আলেম হজরত ইমাম সাঈদ নুরসির আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু আফসোস, পরবর্তিতে তিনি সেই প্রভাব আর ধরে রাখেননি!

চৌদ্দ বছর বয়সে গুলেন তার পিতার মসজিদে জুমার খুতবা দেন। এলাকার লোকজন খুতবা শুনে খুব প্রশংসা করেন। গুলেন তখন থেকে সাঈদ নুরসি রহ.' র জ্ঞান- গরিমা মানুষের মাঝে প্রচার

করতে থাকেন। উনিশ বছর বয়স তিনি আরদরুম (erzurum) ছেড়ে পশ্চিম তুরস্কের আদ্রানা শহরে চলে যান। সেখানে তিনি শহরের জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর ১৯৬৬ সনে ইজমিরে চলে যান। পঁচিশ বছর বয়সে গুলেন ইজমিরের কোনো এক মসজিদে ইমাম ও খতিব নিয়োগ হন। তখন থেকে ইমাম নুরসি রহ.' র পথ অনুসরণ করে তিনি ব্যবসায়ী ও সরকারি চাকুরিজীবিগণের মাঝে ইসলামি দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। এবং নিজের যোগ্যতায় ইজমিরের জামে মসজিদের আওতাধীন তাহফিযুল কুরআন মাদ্রাসাকে মারকায বানিয়ে কাজ চালিয়ে যান। গ্রামগঞ্জ ও বিভিন্ন শহরে গিয়ে বয়ান- বক্তৃতা করতে থাকেন। ধীরে ধীরে ইরজরুম ও ইজমির[২০] প্রদেশসহ অন্যান্য রাজ্যেও তার খ্যাতি বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

মতাদর্শের পরিবর্তন ও প্রচার পদ্ধতি

১৯৭০ থেকে বিভিন্ন জায়গায় তরবিয়াতি মজলিস করতে থাকেন। এভাবে এক সময় তুরস্কের জনগণ তাকে পীর ভাবতে শুরু করে। গুলেনের প্রভাব এতোটাই বেড়ে চলে যে, ১৯৭১ সনে সেনাসরকার তাকে এই অজুহাতে গ্রেফতার করে, গুলেন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে!

গ্রেফতারের ছয় মাস পর তিনি মুক্তি পান। তখন থেকেই মূলত তার মতাদর্শে বিস্তর ফারাক তৈরি হয়। তিনি অনুধাবন করলেন, সেনাবাহিনি এবং সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গকে নিজের দলে ভেড়াতে না পারলে উদ্দেশ্যে সফল হওয়া যাবে না।

---

[২০] ইজমির তুরস্কের আনাতোলিয়ার পশ্চিম সীমান্তের একটি মহানগর শহর। ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার পরে এটি তুরস্কের তৃতীয় সর্বাধিক জনবহুল শহর এবং গ্রিসের অ্যাথেন্সের পরে এজিয়ান সাগরের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল। সূত্র: বাঙলা উইকিপিডিয়া।

গুলেনের কর্মকাণ্ডে সরকারপক্ষ তাকে বিভিন্ন শহরে বদলি করাতে থাকে। দশ বছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু গুলেন যেখানেই যান, নিজের অগ্নিঝরা বক্তৃতায় লোকদেরকে আকৃষ্ট করতে থাকেন।

গুলেন মূলত জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তিনি তার চিন্তা- চেতনা ও কর্মকাণ্ডে জাতীয়তাবাদের পক্ষে লড়ে যেতেন। পরে রাজনৈতিক জীবনে তিনি পশ্চিমা বিভিন্ন দার্শনিকদের মতাদর্শ লালন করতে থাকেন।

১৯৮০' র পরে আতাতুর্ক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাহায্যে তিনি ' খেদমত' নামে নতুন আন্দোলন শুরু করেন। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ মুহাম্মাদ ওয়ায়েল হাম্বলি বলেন, গত দশ বছর ধরে ' খেদমত' র অনেক সদস্য আমাদের সাথে সিরিয়া, কুয়েতের অনেক এলাকায় সাক্ষাৎ করে। তিনি বলেন, এরা মূলত দাওয়াত- তাবলিগের কথা বলে বিভিন্ন জায়গায় আসতো। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো, বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিত্বদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের দলে ভেড়ানো আর চান্দা কালেকশন করা। এরা বিভিন্নজনের সামনে গুলেনকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতো। সুফি, দরবেশদের কাছে গুলনেকে অনেক বড় সুফি বলে প্রমাণ করতো। আলেমদের কাছে গিয়ে তাকে হাদিস, ফিকহে গভীর জ্ঞানের পণ্ডিত হিসেবে পেশ করতো। সাইন্সিস্টদের কাছে গিয়ে মহাবিজ্ঞানী বলে বেড়াতো। রাজনীতিবিধদের নিকট তাকে যুগের শ্রেষ্ঠ ও সৎ রাজনীতিবিধ হিসেবে তুলে ধরতো। এভাবেই ওরা ওদের মিশনে এগিয়ে চলছিলো......

গুলেনের ' খেদমত' আন্দোলনের শুরুটা হয়েছিলো তুরস্কে বিভিন্ন স্কুল, একাডেমি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরির মধ্য দিয়ে। সেখানে প্রথম ক্লাস থেকেই সিলেবাসে ইংলিশ আবশ্যক ছিলো। ছেলে,

মেয়েদের মধ্যকার পরস্পর যৌনপ্রীতির প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হতো। বারো, চৌদ্দ বছরের কিশোর- কিশোরীদের মধ্যে একে অন্যের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার উৎসাহ দেয়া হতো। গুলেনের এই সিস্টেমের স্কুলগুলোতে স্টুডেন্টদের জন্য হোস্টেলে থাকা অপরিহার্য ছিলো। গুলেনের অনুসারীরা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের ছোটো ছোটো সন্তানদেরকে এসব স্কুলে ভর্তির জন্য বিভিন্নভাবে বুঝাতো। সেনাবাহিনি, পুলিশ, আদালত, আইন সহ বিভিন্ন বিভাগে জব পাওয়ার লোভ দেখিয়ে অভিভাবকদেরকে আকৃষ্ট করে তুলতো।

গুলেন তুরস্ক ছাড়া ইসলামি এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্রেও বড় বড় স্কুল তৈরি করে।

গুলেন ১৯৯৮ সনে দ্বিতীয় পোপ জন পলের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করে। এরপর ইহুদিদের সাথে তার সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। এক সময় তিনি ফোতয়া দেয়, ইহুদি ও খৃস্টানরাও জান্নাতে যাবে! ফোতয়ায় সে আরো বলে, কুরআন ও হাদিসে শুধু মুসলিমদের জন্য জান্নাতের যে ওয়াদার কথা বলা হয়, তা মূলত আরবের মূর্খ বেদুইনদের বিকৃতি! (নাউযুবিল্লাহ)

এই ফোতয়া দেওয়ার ফলে ইহুদি পুঁজিবাদীরা গুলেনকে লক্ষ লক্ষ ডলার পুরষ্কার দেয়। যে টাকা দিয়ে তিনি তুরস্ক ও অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রায় তিন হাজার স্কুল তৈরি করেন। স্কুলের আয় থেকে আবার পত্রিকা- ম্যাগাজিন, রেডিও- টেলিভিশন সেন্টার, স্টক এক্সেঞ্জ ও ব্যাংকিং সহ বিভিন্ন খাতে গুলেন ধাপে ধাপে উন্নতি করতে থাকে। তুরস্কের আটটি টেলিভিশন চ্যানেল গুলেনের পরিচালিত। তুরস্কের যে সব ফিল্ম, নাটক পাকিস্তানে অত্যন্ত আগ্রহভরে দেখা হয়, সেগুলো গুলেনের টিভি নেটওয়ার্ক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। কারবারের বিশাল আয়োজনে গুলেন এতটাই উন্নতি করে, ২০১৩

পর্যন্ত তার ' খেদমত' সংস্থার বার্ষিক আয় ৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যায়।

ইহুদিবাদী লবিদের[২১] সহায়তায় গুলেন আমেরিকায় ১২৯ টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। যেগুলো থেকে বার্ষিক আয় হয় প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার। পাকিস্তান, বাঙলাদেশ সহ অন্যান্য রাষ্ট্রেও ইহুদিদের সহযোগিতায় গুলেন অনেক স্কুল তৈরি করে। এসব স্কুলের পরিচালকগণ বাহ্যিকভাবি দাবি করে, তারা তুর্কি কালচার-সভ্যতা বিকাশে কাজ করে। কিন্তু ওদের অধিকাংশের গোড়া হলো ফাতহুল্লাহ গুলেন। তুরস্কের মতো বহির্বিশ্বের সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝেও গুলেন তার মিশন চালিয়ে যায়।

১৯৮০ সনে গুলেন জেনারেল কেনআনের সামরিক শাসনের ভরপুর সমর্থন করে। গুলেনকে সেনাদের পক্ষ থেকে এর জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ' জামান' নামী একটি অখ্যাত পত্রিকা ছিলো। তখন সামরিক শাসনের পক্ষে থাকায় মাত্র কয়েক দিনেই সেটা তুরস্কের শীর্ষ পত্রিকার স্থান দখল করে নেয়।

এরদোগান ও গুলেন

রজব তৈয়ব এ্যারদোগান ও তাঁর পার্টি তুরস্কের ক্ষমতাসীন দলে পরিণত হলে গুলেন তাদের পক্ষেও কাজ করতে থাকে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাহ্যত এ্যারদোগানের খুব সমর্থন করে যায়। কিন্তু পরোক্ষভাবে সে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ্যারদোগান সরকারকে

---

[২১] এদেরকে জায়নিস্ট লবি বলে। আর এদের মতাদর্শকে জায়নিজম বলে। এর আরবি শব্দ বলো, صهيونية. ফিলিস্তিনকে ইহুদি রাষ্ট্র বানানো সহ বিশ্বব্যাপী শয়তান, মাসীহ, ইলুমিনানি, ফ্রি ম্যাসনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এদের মূল টার্গেট। জায়নিস্টরা মনে করে, ফিলিস্তিন হলো তাদের প্রাচীনতম ভূমি। খৃস্টপূর্ব কালে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে বাস করতো। যিশুর আবির্ভাবের পর ফিলিস্তিনে খৃস্টান শাসন প্রতিষ্ঠা হলে ইহুদিরা সেখান থেকে বিতারিত হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে উসমানি খেলাফতকে উচ্ছেদ করে তারা আবার এর আশপাশে একত্রিত হয়। প্রতিষ্ঠা করে ইসরাইল রাষ্ট্র। ইংল্যান্ডের সাথে আমেরিকাও তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করে। সূত্র: উইকিপিডিয়া আরবি।

দমানোর চেষ্টা চালায়। সেনাবাহিনির ঊর্ধ্বতন অনেক অফিসারের সাথে গোপনালাপের পর তাদের ফোন রেকর্ড করে ব্ল্যাকমেল করে। এবং তাদেরকে কৌশলে নিজের দলে ভেড়ায়। বাধ্য হয়ে এ্যারদোগান তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

গাজার নিরিহ ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ্যারদোগানই বিশ্বের প্রথম শক্তিশালী আওয়াজ তুলেন। অথচ গুলেন তখন এ্যারদোগানের বিপরীতে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের এসব জুলুম- নির্যাতনকে তাদের মধ্যকার নিজস্ব বিষয় বলে ইসরাইলকে নির্দোষ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে।

২০১৩ তে গিজি পার্কে এ্যারদোগানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের মূল হোতা গুলেনই ছিলো। এবং আন্দোলনকারীদের নব্বই পার্সেন্টই ' খেদমত' সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

এতসব চক্রান্ত আর ইহুদিদের সাথে গোপন আঁতাতের কারণে এ্যারদোগান গত তিন বছরে গুলেনের ' খেদমত' সংস্থার হাজার, হাজার কর্মীকে বিভিন্ন সরকারি পদ থেকে বহিষ্কার করেন। ফলে গুলেন এ্যারদোগানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উসকে দেয়। এবং সেনাশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে জনগণের ভালোবাসায় এ্যারদোগান এ বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

এ্যারদোগানের এই সফলতায় বিশ্ব ইহুদি- খৃস্টান শক্তি যে কষ্ট পেয়েছে, তা ঘুচাতে ওরা বসে থাকবে না নিশ্চয়। তাই এ্যারদোগানকে আগের থেকে জনগণের আর বেশি প্রিয় হতে হবে। জাতি ও ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিতে হবে ভবিষ্যতের দীর্ঘ পথ। দুআ করি, আল্লাহ যেনো তুরস্ককে শত্রুদের সকল অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন! পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামি খেলাফত!!

নয়া তুরস্কের বৈপ্লবিক সৈনিক ইমাম সাঈদ নুরসি রহ.

মূল

ইহসান কাসেম সালেহি

(মূল বই আরবি ভাষায় লিখিত। লেখক, ইরাকের বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ ইহসান কাসেম সালেহি। নয়া তুরস্কের বৈপ্লবিক সৈনিক হিসেবে যিনি কাজ করেছেন, সেই সাঈদ নুরসির জীবনী নিয়েই লেখা এই ছোট্ট পুস্তিকা। বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা ও গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে পুস্তিকাটির অনুবাদ সংযোজন করা হচ্ছে।)

ভূমিকা

বাদিউজ জামান সাঈদ নুরসি রহ.। তুরস্কের একটি বিখ্যাত নাম। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের শাসনামলে তিনি সাম্রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান-গরিমায় গভীর পাণ্ডিত্যের পাশাপাশি একজন অন্তরদর্শী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। উসমানি খেলাফত তখন পতনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছিলো। ইসলামি খেলাফত ধ্বংসের জন্য শত্রুদের নানা অপকৌশল আর অপচেষ্টার স্পষ্ট সাক্ষি ছিলেন হজরত সাঈদ নুরসি রহ.। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো একযোগ হয়ে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। এবং পঞ্চম মুহাম্মাদকে মসনদে বসিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ইন্ধনে পরিণত করে। এর ফলেই মূলত কাঁচের মতো ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ ও টুকরো টুকরো হয়ে যায় উসমানি খেলাফত। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সম্মিলিত মিত্র শক্তির নেতৃবৃন্দ দেশের বাহিরে পালিয়ে যায়। রাষ্ট্রের নিরীহ জনগণকে ফেলে যায় যুদ্ধের সেই ধ্বংসাস্তুপে। আর তখনই সরাসরি বহিঃশক্তির পদোপিষ্ট হয় মুসলিম ইতিহাসের ঐতিহ্যময় তুর্কি সাম্রাজ্য।

এরপর ক্ষমতায় আসেন সুলতান মুহাম্মাদ ওহীদুদ্দীন। রাষ্ট্র তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত। তুর্কিস্তানের সর্বত্রই ছেয়ে যায় গ্রিস, আর্মেনীয় আর ইতালি ইংরেজদের উপদ্রব। এমনকি রাজধানী ইস্তাম্বুলও আক্রান্ত হয় ইংরেজদের হিংস্রতায়।

ভয়ানক এ ঘূর্ণিঝড় রুখতে, শত্রুদের এই বিষাক্ত তীর আর ঔপনিবেশিকদের এই ধারালো বর্শার আঘাত থেকে রক্ষা পেতে তুর্কিদের কাছে তাদের ঈমানকে মজবুত ও দৃঢ় করাই ছিলো প্রধান

সম্বল। ঈমানের এ সম্বল নিয়েই তখনকার ইমাম সাঈদ নুরসি রহ. তুর্কি মুসলিমদের দ্বীন রক্ষার্থে এগিয়ে আসলেন। বহিঃশক্তির মোকাবেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে একত্রিত করে নবোদ্যমে শুরু করেন এক বৈপ্লবিক আন্দোলন। যা আজ তুর্কির 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। নুরসির স্বাধীনতা আন্দোলনে তুরস্কের জনগণ নতুন দিশা খুঁজে পায়। জনগণের চাপের মুখে বহিঃশত্রু তুরস্ক ছাড়তে বাধ্য হয়।

কিন্তু আফসোস, ওরা দেশ ছাড়লেও ওদের বীজগুলো ছিটিয়ে গেছে তুরস্কের পুরা গাত্রে, শিরা-উপশিরায়। তাদের বপন করা সেই বীজ থেকেই রাজ্যের ভেতরগত শত্রুরা গজিয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। প্রকাশ্যে শুরু করে ইসলামের শত্রুতা। উম্মাহর হৃদয়ে প্রথিত ঈমানের মজবুত রশিকে উপড়ে ফেলতে ওরা তখন চালাতে থাকে হাজারো অপচেষ্টা।

উম্মাহর এ বিপজ্জনক মোড়ে মানব সভ্যতার জন্য রাক্ষুসে থাবা থেকে রক্ষাকবজ হিসেবে নতুন এক আন্দোলন শুরু করেন বদিউজ জামান ইমাম সাঈদ নুরসি রহ.। যে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, উম্মাহর দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হওয়া আর মুসলিমদের হৃদয়ে ঈমানের নিভু নিভু প্রদীপ পুনরায় প্রজ্বলিত করার পয়গাম নিয়ে ছুটে চলা। রাজনীতি পরিত্যাগ করে দাওয়াত ও ইরশাদের পথকেই বেছে নেন নুরসি রহ.। নিমগ্ন হন কালি ও কলমের জগতে। রচনা করেন 'রসায়েলে নুর' নামে যুগোপযোগী ও কালজয়ী বিভিন্ন গ্রন্থ। কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও উম্মাহর দারে দারে হাজির হন আলোর মশাল নিয়ে। ঈমানি চেতনায় ভরপুর একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার মানসে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেন তুরস্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

জন্ম

তিনি হিজরি ১২৯৪ মোতাবেক ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান দক্ষিণপূর্ব তুরস্কের ' নুরস' নামক এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতাও ধার্মিক হিসেবে সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আদর করে তারা সদ্যভূমিষ্ট হওয়া পুত্রের নাম রাখেন ' সাঈদ' ।

জ্ঞানার্জন

বাল্যকালে গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। মেধাশক্তি খুবই প্রখর ছিলো। নতুন কোনো বিষয় চোখের সামনে পড়তেই সাঈদ নুরসি তা অতি সহজে মুখস্ত করে নিতেন। পড়ালেখাকালীন ইলমের ব্যাঘাত ঘটে এমন সব কিছু থেকেই নিজেকে দূরে রাখতেন। তাই সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করাটা তাঁর মনঃপূত হতো না। তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। সত্যের অভিসারী। ইলমের জন্য সফর করতেন এক জায়গা থেকে অন্যত্র। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে। এক আলেম থেকে অন্য আলেমের কাছে।

কিন্তু সাঈদ নুরসি তাঁর শিক্ষকদের থেকে আশানুরূপ কোনো কিছু পাননি। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ছেড়ে নিজস্বভাবে ইলম অর্জন শুরু করেন। ফেৎনার সে যুগেও দেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে ইসলামি বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞান চর্চা করতে থাকেন। তাফসির, হাদিস, আরবি ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্রসহ ইসলামি সকল শাখার যে কোনো কিতাব পেলেই পড়তেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আশ্চর্য রকমের স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। কুরআন ও হাদিসের যে কোনো বিষয় তাঁর সামনে পড়লেই দ্রুত মুখস্ত করে ফেলতেন। এমনকি মাত্র কয়েক দিনের ভেতরেই বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রায় নব্বইটি বই সম্পূর্ণ মুখস্ত করে ফেলেন।

প্রচুর মেধাশক্তি আর চেষ্টা- সাধনার কারণে অল্প বয়সেই প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে যান। ফলে বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর উঠাবসা শুরু হয়ে যায়। তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বাহাস, মোনাজারা করতে থাকেন। লোকজন তাঁকে অনেক কনফারেন্স ও বাহাসে দাওয়াত করতে থাকে। তৎকালীন বড় বড় বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতদের সাথেও মোনাজারা করে তিনি বিজয়ী হন। এভাবে ধীরে ধীরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুনাম- সুখ্যাতি।

১৩১৪ হিজরি মোতাবেক ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ' ওয়ান' এলাকায় গমন করেন। সেখানে খুব একাগ্রতার সাথে গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূ- তত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস সহ জাগতিক অনেক বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। ইসলামিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যুগের অনেক জ্ঞানী- গুণী ব্যক্তিবর্গও স্বীকার করেছেন।[২২] করেছেন তাঁর ভূয়সি প্রশংসা। ফলে সাঈদ নুরসি ' বদিউজ জামান' উপাধীতে ভূষিত হন।

আচমকা একটি খবর, কেড়ে নিলো তাঁর ঘুম

স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে হঠাৎ একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সচিব গ্ল্যাডস্টোন বৃটিশ পার্লামেন্টে মন্ত্রি- মেনিস্টারদের সম্বোধন করে বলেছে, " যতদিন মুসলিমদের হাতে কুরআন থাকবে, আমরা তাদেরকে শাসন করতে পারবো না। সুতরাং কুরআনের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিলেই তবে মুসলিমদের বিশ্বাসে

[২২] ইসলামি ও জাগতিক উভয় প্রকার শিক্ষায় নুরসির পাণ্ডিত্বের কথা মুফাক্কিরে ইসলাম হজরত আলি মিয়া নদভি রহ.ও তাঁর এক পত্রে বলেছেন। হজরত মুফাক্কিরে ইসলাম রহ. তাঁর সম্পর্কে খুব আবেকভরে বলতেন, আমি এ মহান ব্যক্তিটির জন্য সব সময় কুরআন তেলাওয়াত করে দুআ করি! সূত্র: মুকাদ্দামা মুনতাখাব ওয়াহদাতে রসায়েল, পৃষ্ঠা- ৫

রাজত্ব করা সম্ভব হবে। তাই কুরআনকে মিটিয়ে দেওয়া কিংবা কুরআনের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে"।

এ সংবাদ হজরত নুরসিকে কঠিনভাবে আহত করে তুললো। তাঁর ঘুম কেড়ে নিলো। বৃটিশদের বিপক্ষে তিনি ঘোষণা করলেন, আমি বিশ্বের সামনে প্রমাণ করে ছাড়বো, কুরআনে কারিম এমন এক নুর যার আলো কখনো নিভানো সম্ভব নয়। এমন এক সূর্য, যার কিরণ কখনো নির্বাপিত হবার নয়।

কিছুদিন পর হজরত নুরসি ১৩২৫ হি./ ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইস্তাম্বুল চলে আসেন। এবং তৎকালীন সুলতানের কাছে একটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন। এবং মিশরের জামিয়া আজহারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাদ্রাসাতুয যাহরা নামে নামকরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, এর মাধ্যমে ইসলামি শরিয়ার প্রচার- প্রসার করার পাশাপাশি জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করে তোলা।

নুরসি যখন যুদ্ধের সিপাহসালার

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে হজরত নুরসি তুর্কি মুজাহিদদের কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন। তিনি মূলত নিজ ভক্তদের নিয়ে বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে একদল জানবায মুজাহিদ দল গঠন করেন। যারা মাতৃভূমি তুর্কিস্তানের জন্য নিজেদেরকে কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। হজরত নুরসি তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে ককেশাসের প্রান্তে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তবে, যুদ্ধের ময়দানে তিনি আহত হন। তাঁকে বন্দি করে রাশিয়ার কোস্টোর্মাতে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দি অবস্থায় তিনি সেখানে দুই বছর চার মাস অতিবাহিত করেন।

এরপর বলশেভিয়া[২৩] বিপ্লবের সময় মুক্তি পান। দেশে ফিরলে তাঁকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অভ্যর্থনা দেয়া হয়। এবং তৎকালীন তুরস্কের

---

[২৩] বলশেভিক (ইংরেজি: Bolsheviks বা আদিরূপ Bolshevists, উৎপত্তি bol'shinstvo থেকে, যার অর্থ "majority" বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা) হলো মার্কসবাদী রাশিয়ান সোস্যাল

খলিফা, রাষ্ট্রের শাইখুল ইসলাম ও প্রধান সেনাপতি সহ কলেজ-ইউনিভার্সিটির শরিয়া বিভাগের হাজার, হাজার ছাত্ররা তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়। এবং সামরিক পদকে ভূষিত করা হয়।

তখন উসমানি সাম্রাজ্যের খলিফা তাঁকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করতে চান। কিন্তু উলামাকর্তৃক পরিচালিত ইসলামিক গভর্নমেন্ট হাউসের সদস্য হওয়ায় সামরিক কমান্ডের দায়িত্ব ছাড়া বাকি সকল পদই প্রত্যাখ্যান করে দেন। এ সময় তিনি তাঁর আরবিতে লিখিত কিছু বই দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। এগুলোর মধ্যে কুরআনের ভাষাশৈলীমূলক তাফসির গ্রন্থ ' ইশারাতুল ই' জায' অন্যতম। যা তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে লিখেছিলেন। এমনিভাবে ' আল মাছনাবি আর আরাবি আন নুরি' ও উল্লেযোগ্য।

ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির একটি উপদল যা ১৯০৩ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এর অপর উপদল মেনশেভিক থেকে আলাদা হয়ে যায়।

বলশেভিকেরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাই তাদের এই নাম। পরবর্তীতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। বলশেভিকেরা ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকালীন অক্টোবরের বিপ্লবের সময় রাশিয়ার ক্ষমতায় আসে এবং রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের পত্তন করে। যা পরবর্তীকালে ১৯২২ সালে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ভ্লাদিমির লেনিন এবং আলেকজান্ডার বগদানভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক ১৯০৫ সাল নাগাদ একটি গণসংগঠনে পরিণত হয়। যার সদস্য মূলতঃ ছিলো অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পদবিন্যাসে সংগঠিত শ্রমিক জনগোষ্ঠী, যা কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হতো। তারা নিজেদেরকে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসেবে বিবেচনা করতো। তাদের বিশ্বাস ও কার্মকাণ্ডকে প্রায়ই বলশেভিকবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসনের পর বিপ্লবী বলশেভিক নেতা লিওন ত্রোত্স্কি তার প্রত্যক্ষ করা প্রকৃত লেনিনবাদ এবং জোসেফ স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র ও দলের মধ্যকার পার্থক্য বোঝাতে সাধারণভাবে ' বলশেভিক' এবং ' বলশেভিস্ট' শব্দ দুটি ব্যবহার করতেন। সূত্র: উইকিপিডিয়া বাঙলা

হজরত নুরসি কোস্টোর্মা থেকে মুক্তি পেলে তাঁর সাথে অন্যান্য মুজাহিদগণও মুক্তি লাভ করে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। এরপর ধীরে ধীরে তুরস্কের পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হতে থাকে। স্বদেশী গাদ্দাররা মুসলিম খলিফা ও ইসলামি শরিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন চালিয়ে যায়। হজরত নুরসি তখন অনুভব করলেন, ' মুসলিম বিশ্বের দিকে নাস্তিকতার এক ভয়ঙ্কর ঝড় ধেয়ে আসছে। সে ঝড়কে রুখতে তাঁকেই এগিয়ে আসতে হবে। ' হজরত নুরসি তখন বিভিন্ন বই লিখে জনসমাজে ইসলামি চেতনা তৈরির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তৎকালীন উসমানি সাম্রাজ্যে নিরাশার ধুম্রজাল আর পথভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে জাতিকে রক্ষার জন্য একাই লিখতে থাকেন একের পর এক সারা জাগানো কালজয়ী গ্রন্থ।

নতুন চিন্তার উন্মেষ; কুরআনই আমার শিক্ষক

হজরত নুরসি নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা নিজেই বলেন,

" ত্রিশ বছর পূর্বে পুরোনো গাফেল সাঈদ কিছু বিষয় নিয়ে খুব চিন্তিত হয়। সে ভাবে, নিশ্চয় মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত। নিজেকে মনে হয়, যেনো কর্দমার ড্রেনে নিপতিত এক সাহায্যপ্রার্থী। যে ময়লার দুর্গন্ধে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে! খুঁজতে থাকে সত্যের পথ। কামনা করে একজন উদ্ধারকারীকে। যে তার হাত ধরে জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে রক্ষা করবে।

অবশেষে আমার সামনে কয়েটি পথ বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনটা রেখে কী করবো, তা ভেবে পেরেশান হয়ে যাই। হঠাৎ একদিন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ.' র ফুতুহুল গায়ব নামাক কিতাবটি আমার হাতে আসে। আল্লাহর কাছে শুভকামনা করে খুলতেই এই ইবারতটা দৃষ্টিগোচর হয়-

أنت في دار الحكمة، فاطلب طبيبا يداوي قلبك

অর্থ: তুমি এই দারুল হিকমায় (পৃথিবী নামক আসবাবের জগতে) বসবাস করো, তোমার জন্য একজন হাকীম ও ডাক্তার প্রয়োজন, যে তোমার কলবের চিকিৎসা করবে।

আশ্চর্য! আমি তখন বাস্তবেই ইসলামি হুকুমতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলাম। এই পদে সমাসীন হয়ে আমি মুসলিম উম্মাহর ক্ষতগুলোর চিকিৎসা করতে চাচ্ছি, অথচ আমি নিজেই কঠিন রোগে আক্রান্ত! অন্যের চেয়ে আমি চিকিৎসার বেশি মুখাপেক্ষী। তাই একজন রোগীর জন্য অন্যের কথা ভাবার পূর্বে নিজের জন্য ডাক্তার দেখানোই জ্ঞানীর কাজ।

আমার মনে হচ্ছিলো, হজরত শায়খ জিলানী রহ. যেনো আমাকেই সম্বোধন করে বলছিলেন, সাঈদ! তুমি নিজেই ব্যাধিগ্রস্ত। ডাক্তার দেখাও। যে তোমার আত্মার চিকিৎসা করবে। হোক সে চিকিৎসক তোমার কুরআন ও হাদিস কিংবা কোনো শায়খ ও মুরশিদ।

আমি মনে মনে বললাম, শায়খ! আপনিই আমার ডাক্তার। আপনিই আমার চিকিৎসক। আপনার থেকেই আমি আমার কলবের চিকিৎসা নেবো।

হজরত শায়খ জীলানি রহ.' র কিতাবটি আমি ধীরে ধীরে পড়তে থাকলাম। শায়খের প্রতিটি শব্দ ও কথা আমার সব অহংকারকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলো। ছুড়ির মতো যেনো হৃদয়ের ক্ষতগুলোকে কাটছিলো। কিন্তু আমি আর শায়খের বাণীগুলোর ভার সইতে পারলাম না। মনে হচ্ছিলো, প্রতিটি বাক্য যেনো আমাকে লক্ষ্য করেই বলছিলেন!

তবুও অনেক কষ্টে প্রায় অর্ধেকটা শেষ হলো। পুরাটা পড়া সম্ভব হলো না। অবশেষে গুছিয়ে তাকে রেখে দিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! কিছু দিন যেতেই অন্তরে অন্য রকম স্বাদ অনুভব হলো। যেনো ক্ষতগুলো শুকিয়ে হৃদয়ে রুহানি লাজ্জাত সৃষ্টি করছে।

তখন আবার পড়তে শুরু করলাম। এবার পুরাটা পড়েই ফেললাম। শায়খের কিতাবাদি বারবার পড়লাম। নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। শায়খের বাণীগুলো আমার হৃদয়কে শীতল করে তুললো।

এরপর একদিন মুজাদ্দেদে আলফে ছানি ইমাম আহমাদ ফারুকি সারহিন্দি রহ.' র কিতাব ' মাখতুতাত' হাতে আসলো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় প্রাপ্তি ছিলো। তখন কিতাবটি খুলতে এক আশ্চর্য রকমের মিল লক্ষ করলাম। মাকতুবাতের দু' টি রেসালাতে ' মির্জা বদিউজ জামান' নামটা এসেছে। মনে হচ্ছিলো, আমার নাম ধরেই বুঝি সম্বোধন করছেন! আমার পিতার উপাধি হলো মির্জা। আবার আমার স্বত্তার সেই পুরোনো সাঈদের উপাধিও বদিউজ জামান। কী আশ্চর্য মিল! সকল নসিহত যেনো হজরত মুজেদ্দেদে আলফে ছানি আমাকেই বলছেন!

আমি জানতাম, চতুর্থ হিজরির হামাদানি ব্যতীত অন্য কেউ বদিউজ জামান উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলো না। তাহলে নিশ্চয় হজরত মুজেদ্দেদে আলফে ছানির যুগে আরেক ব্যক্তি ছিলেন, যাকে তিনি বদিউজ জামান বলে সম্বোধন করেছেন। এদিকে আমার কলবের রোগগুলোও সেই বদিউজ জামানের মতোই দেখছি! তাহলে হজরত মুজেদ্দেদে আলফে ছানির এ বই- ই আমার জন্য উত্তম প্রতিষেধক।

মুজেদ্দেদে আলফে ছানি একটি কথা বারবার বলেছেন, কাউকে নিজের পীর ও মুরশিদ হিসেবে অনুসরণ করো! এটাই তোমার জীবন বদলে দেবার জন্যে যথেষ্ট।

শায়খের বাণী আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেলো। চিন্তায় পড়ে গেলাম, কী করবো? কীভাবে বাস্তবায়ন হবে শায়খের এ উপদেশ? অবশেষে হঠাৎ একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হলো। কুদরতি বায়ু এসে আমার দিলকে শান্ত করে দিলো। যেনো বলতেছিলো, সকল সঠিক পথের উৎস হলো কুরআনে কারিম।

গ্রহ- নক্ষত্র, চন্দ্র- সূর্য মোটকথা বিশ্ব- ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর একমাত্র ছায়াপথ হলো কুরআনে কারিম। অতএব আমার গন্তব্য কুরআনের পথেই ফেরাতেই হবে। কুরআনই আমার পীর। কুরআনই আমার মুরশিদ। কুরআনই আমার শিক্ষক। কুরআনই আমার চিকিৎসক।

তখন থেকেই আমার একমাত্র নেশা কুরআন ও কুরআনের তাফসিরকে ঘিরেই। অযোগ্যতার কারণে হয়ত কুরআনের উৎসরিত ঝর্ণার সুমিষ্ট পানিতে আমি নিজেকে এবং নিজের জাতিকে তেমন সিঞ্চিত করতে পারিনি। তবে, এটা চিরন্তন সত্য, কুরআনের মহাসমুদ্র থেকে মুক্তা কুড়াতে হলে নিজের হৃদয়কে পরিষ্কার করা ছাড়া কোনো গতি নেই।

আল্লাহর রহমতে কুরআনকে সামনে রেখে তখন থেকেই অগ্রসর হতে থাকি। খোদাদ্রোহী এই সমাজকে কুরআনের পথে ডাকতে লিখি ' আল কালিমাত' , ' আশ শুআআত' ' র মতো অনেক গ্রন্থ। যেগুলো মূলত কুরআনে কারিমের সেই উৎসরিত নুরের ঝর্ণার সামান্য ঝলক। আজ যা রসায়েলে নুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এতে আমি জটিল কোনো তত্ত্ব নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামকৃত হৃদয় নিংড়ানো কিছু ব্যথাই পেশ করেছি মাত্র। হতে পারে আজ তা নাস্তিকতার আবরণে পথভ্রষ্ট জাতির কিছুটা হলেও কাজে দিবে। "

(হজরত নুরসির কথা শেষ হলো)

দেশান্তর

তখন উসমানি খেলাফত যেনো মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। রাষ্ট্রের ভেতর ও বহিরাগত মুসলিম শত্রুরা নানা ষড়যন্ত্র করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছিলো। অতঃপর এক সময় কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে উসমানি খেলাফত ধ্বংস করে দেয়। হজরত নুরসি

রাজনীতি ছেড়ে শত্রুদের লাল চক্ষুকে উপেক্ষা করে দ্বীনের দাওয়াতে মগ্ন হন। কিন্তু শত্রুদের তা আর সহ্য হয় না। তারা হজরত নুরসি তাঁর সহযোগী ভক্তগণের পেছনে পড়ে। এবং ১৯২৬ সালের প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে তাঁকে ও তাঁর ভক্তদেরকে আনাতোলিয়ায় দেশান্তর করে। আনাতোলিয়া থেকে একাকী তাঁকে আবাদির বহু দূরে বনজঙ্গল ও পাহাড়- পর্বতময় এলাকা বারলায় পাঠিয়ে দেয়। বারলার এই উপায়- উপকরণহীন কষ্টের জীবনেই তিনি লিখে যান অসংখ্য বই- পুস্তক।

রসায়েলে নুর প্রকাশের ইতিহাস

রসায়েলে নুর প্রকাশের ঘটনা হজরত নুরসি নিজেই বর্ণনা করেন,

"হজরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানি রহ.' র নসিহাত পড়ে আমি কুরআনের খেদমত করার সিদ্ধান্ত নেই। এরপর পুরা জীবন কুরআনের পেছনেই ব্যয় করি। আমি যেনো নতুন এক সাঈদ রূপে জীবন- যাপন করতে থাকি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, দ্বীনের সেবা করতে গিয়ে আমাকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় দেশান্তরিত হতে হয়। এ সময় আমার অন্তরে কুরআনে কারিমের ফয়জ যেনো জোয়ারের মতো প্লাবিত হতে থাকে। আমি সেগুলো সঙ্গি- সাথীদেরকে শুনাতাম। কুরআনে কারিমের সে ফয়জ ও নুরের সমষ্টিই মূলত এই রসায়েলে নুর। কুরআনের নুর থেকে উৎসরিত বলে আমি এগুলোর নামকরণ করি ' রসায়েলে নুর' । যা আমার নিজস্ব কোনো চিন্তাভাবনা নয়; বরং আল্লাহর কালামের তাফসির। আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়ে যেগুলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। যারা কুরআনের এই তাফসিরসমগ্র হাতে লিখে প্রচার করছে, তাদের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভকামনা করি। অরাজকতার এ করুণ পরিস্থিতিতে মানুষের ঈমান রক্ষার জন্যে লেখালিখির এ মাধ্যম ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আল্লাহর অশেষ কৃপা

যে, কিছু আমানতদার মহৎ ব্যক্তি নিজেদের জান বাজি রেখে এগুলো প্রচার- প্রসারের কাজ করছে। কৃতজ্ঞতা সৃষ্টিকর্তার, তিনি আমাকে মুসলিম উম্মাহর ঈমানি আন্দোলনের তৌফিক দিয়েছেন। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর শরিয়ত ও নবিজির সুন্নতকে রক্ষার অনন্য কারিশমা। "

(হজরত নুরসির কথা শেষ হলো)

হজরত নুরসি রহ.' র কর্মজীবনের অধিকাংশই কেটেছে জেল- হাজাত ও দেশান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। বন্দিত্বের শতো কষ্ট সত্ত্বেও চালিয়ে যান কুরআনি আন্দোলন। এমনকি মাত্র বারো বছরে ১৩০ টি বই লিখে ফেলেন। যেগুলো পরবর্তিতে "কুল্লিয়াতে রসায়েলে নুর" নামে একত্র করা হয়। তবে, ১৯৫৪' র আগ পর্যন্ত হাতের তৈরি নুসখাই দেশব্যাপী চলছিলো।

রসায়েল প্রচার পদ্ধতি

কামাল আতাতুর্কের নতুন রাজত্বে ইসলামি সকল নিদর্শনে পাবন্দি আরোপ করা হয়। আজান নিষিদ্ধ হয়। তুর্কি ভাষার আরবি অক্ষরের পরিবর্তে ল্যাটিনি অক্ষর জারি করে। ইসলামি গ্রন্থাগার, ইসলামি বই ছাপানো, প্রচার করা, সবই নিষিদ্ধ হয়। তাই বাধ্য হয়ে হাতে লিখে পাণ্ডুলিপি তৈরি করাই একমাত্র উপায় ছিলো।

ভক্তদের সংখ্যা বাড়লে তারা বারলা থেকে গোপনে মূল পাণ্ডুলিপি পার্শ্ববর্তী গ্রামে নিয়ে যেতো। সেখানে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে হাতে- কলমে আরো নুসখা তৈরি করে লুকিয়ে অন্যান্য শহরে পাঠানো হতো। এভাবেই খোদাদ্রোহিতার ঝড়ের কবলে দৃঢ় পায়ে স্থীর থেকে একাই লড়ে গিয়েছেন যুগের ইমাম হজরত সাঈদ নুরসি রহ.।

মৃত্যু

অবশেষে এ বীর মুজাহিদ ১৩৭৯ হি.' র ২৫ শে রমজান মোতাবেক ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের তেইশ মার্চে আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে পরপারে চলে যান। ওরফা নামক এলাকায় তাঁকে দাফন করা হয়। কিন্তু আফসোস, তৎকালীন জালেম সেনাশাসক মৃত্যুর পরও তাঁকে মুক্তি দেয়নি। মৃত্যুর চার মাস পর তাঁর লাশ উঠিয়ে বিমানে করে অজানা জায়গায় নিয়ে যায়। আজও কেউ তাঁর কবরের খোঁজ পায়নি। আল্লাহ এই মহীরুহকে জান্নাতে শান্তিতে রাখুন! আমীন!

নাজমুদ্দীন আরবেকানের নামে আলি মিয়া নদভি রহ.' র চিঠি

(মূল চিঠিটি মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর কর্তৃক লিখিত বই ' বসফরাস কে কিনারে' ' র ১০৭তম পৃষ্ঠায় আছে৷ সেখান থেকেই চয়ন করা হলো৷)

আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবেকানের নামে প্রেরিত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি মিয়া নাদভী রহ.' র একটি চিঠি

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর নেককার বান্দাদের প্রতি!

সম্মানিত তুর্কি প্রধানমন্ত্রি জনাব নাজমুদ্দীন আরবেকান সাহেব! (আল্লাহ তাঁকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুন, তাঁকে নিজ ফজলে সাহায্য করুন!)

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

আমার খুব আশা ছিলো, এই সফরে আপনার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে। এতে বরকতপূর্ণ ও উদ্দেশ্যজনিত এ সফরটা আরো মহিমান্বিত হয়ে যেতো। এর সাথে প্রয়োজনীয় যে কথাগুলো বলা দরকার ছিলো, সেগুলোও বলতে পারতাম। যে তুর্কি জাতি ইসলামের শত্রুদেরকে পদানত করতে, পবিত্র স্থানগুলোর সংরক্ষণ করতে, মুসলিমদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষার্তে এবং ইসলামি হুকুমতের ঝান্ডা উঁচু করতে নিজেদের সর্বোস্ব দিয়ে চেষ্টা করে গেছে, তাদের সামনে হৃদয় নিংড়ানো চিন্তা- ভাবনাগুলো আদান- প্রদান করা যেতো। আর এভাবেই আমি আমার উপর ফরজ আদায় করতে সক্ষম হতাম। কিন্তু আফসোস, তা আর পুরা হলো না। তবে, আজ এই চিঠির মাধ্যমে আপনার সাথে যেনো সরাসরিই কথা বলছি-

প্রিয় আরবেকান সাহেব! একজন সম্ভাবনাময়ী মুসলিম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা চাই সেটা হলো, এমন

কোনো পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক ছকে ইসলামের জন্য কাজ করা, যা দেশ ও জাতির পক্ষে নতুন বিপ্লব তৈরি করবে। এবং জাতিকে পৌঁছে দিবে নেতৃত্বের চূড়ায়। আর এর একমাত্র পথ হলো, রাষ্ট্রের আপামর জনগণ থেকে নিয়ে কলেজ, ইউভার্সিটির শিক্ষিত শ্রেণী পর্যন্ত সকলের মাঝে ধর্মের চেতনা তৈরি করা এবং তাদেরকে পাশ্চাত্যের গোলামি ও ধ্যান- ধারণা থেকে মুক্ত করা। আরো স্পষ্ট করে বললে, দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সকল ধরণের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মহীনতা ও পাশ্চাত্য খৃস্টবাদের ঝড়কে রুখে দেওয়া। পাশ্চাত্যের যে সভ্যতায় জর্জরিত হয়ে নতুন প্রজন্ম বস্তুবাদী দর্শন ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নিজেদের পূর্বসূরিদের ত্যাগ-তিতিক্ষা, অন্তর্দৃষ্টি, ঈমানি জোশ- জযবা সব ভুলে বসেছে।

শিক্ষার পাশাপাশি তরুণ ও যুবসমাজকে ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলা। বিশেষকরে যুবকদের মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত শ্রেণী, যারা ইসলামকে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে এবং নিজেদের জোশ-জযবা, আগ্রহ- উদ্দীপনায় ভরসা করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখে; তাদের মাঝে বয়ান- বক্তৃতা আর মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামি খেলাফতের প্রতি তাদের হীনমন্যতা ও ভুল ধারণা দূর করে চেতনার নবজাগরণ তৈরি করা।

এই হীনমন্যতা এমন এক ব্যাধি যা উম্মতের যুবকদের মস্তিষ্কে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যে জাতি তাদের ধর্ম ও রীতিনীতি নিয়ে গর্ব করতো, আজ তারা এক পরোক্ষ অন্তর্গত ধর্মহীনতায় ভুগছে। ইউরোপ, আমেরিকার হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। হালাল, হারাম আর ভালো, অনিষ্টের বাছবিচার না করে বিশ্ব নেতৃত্বকে হারিয়েছে।

তাই আজ প্রয়োজন হলো, নতুন প্রজন্মের সামনে ইসলামি ইতিহাসের আলোকে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা করা। তাদেরকে

বুঝানো, ইসলাম তার সকল প্রকার নিয়ম- কানুনসহ এক সত্য আকিদা- বিশ্বাস। এবং বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে মধ্যপন্থা ও ন্যায় নীতির ধর্ম।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও নাস্তিকতার আগুন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মিডিয়া ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনগণকে বিপথ থেকে বাঁচানো। শিক্ষা সিলেবাসে শিশু, যুবক সকল শ্রেণীর উপযোগী এমন বই অন্তর্ভূক্ত করা, যা তাদের দ্বীনি চেতনা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। যতোদিন শিক্ষাঙ্গনে এ কর্মপন্থা চালু না হবে, শতো ত্যাগ- তিতিক্ষা আর চেষ্টা- প্রচেষ্টা করলেও তাদেরকে সত্যের পথে চালানো সম্ভব হবে না।

তবে মনে রাখতে হবে, এ সকল কর্মপন্থায় তাড়িঘড়ি ও জোশের পরিবর্তে হেকমত, কৌশল ও একের পর এক ধারাবাহিকতা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মিডিয়া ও শিক্ষিত শ্রেণী থেকে সহায়তা নিতে হবে। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা। সকল কাজে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসুলে কারিম সা.' র সন্তুষ্টিই যেনো মূল উদ্দেশ্য হয়।

আলহামদু লিল্লাহ, আরবেকান সাহেব, আপনার মাঝে এ সব বিষয়ই বিদ্যমান। আল্লাহ তাআলা আপনাকে নেতৃত্বের যে নেয়ামত দিয়েছেন, তা আপনার মতো ধর্মপ্রাণ সকল ব্যক্তিত্বের ভাগ্যে জুটে না। আল্লাহ আপনাকে উম্মতের রাহবারির জন্যে কবুল করুন! শত্রুদের সকল প্রকার কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করুন! আল্লাহই উত্তম তৌফিক দাতা। আমীন!

(উসমানি খেলাফতের রেখে যাওয়া কিছু নিদর্শন। ছবিগুলোর অধিকাংশই ছাপিয়েছেন মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর তাঁর বই ' বসফরাস কে কিনারে' ' র ১০৮- ১১৫ পৃষ্ঠায়। এর সাথে লুজান চুক্তি ও বসফরাস প্রণালীও যুক্ত করা হয়েছে)

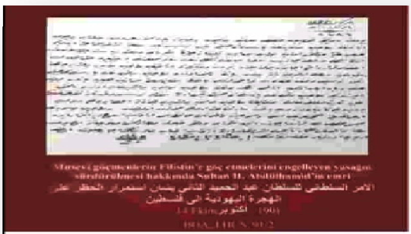

সুলতান আব্দুল হাদিমের নির্দশনামা। যাতে তিনি ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য বসতি স্থাপনে পাবন্দি আরোপ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে সুলতানের ঈমানি দৃষ্টিশক্তি বুঝতে পেরেছিলো যে, কোনো নিপিড়িত মুহাজির কিংবা গরিব জনগণ নয়; বরং এরা হলো চতুর, নির্লজ্জ, কব্জাকারী, অত্যাচারী ও লোভীদের দল।

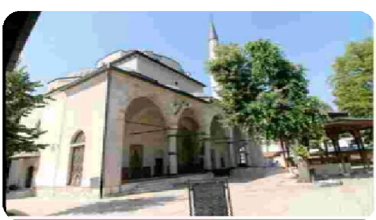

তুরস্কের সারায়ু এলাকায় প্রতিষ্ঠিত উসমানি গভর্নর গাজি খসরু বেকের প্রতিষ্ঠান। যেখানে উম্মতে মুসলিমাকে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা এবং ওয়াকফ বোর্ডকর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যয়ের দু' সফল নেজামের বাস্তব রূপ বিদ্যমান ছিলো। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় ও জাগতিক, উভয় প্রকার শিক্ষার সমন্বয়ে একক সিলেবাস। পাশাপাশি শিক্ষার ব্যয়ও সরকার কিংবা মুতাওয়াল্লীর ওয়াকফ বোর্ড থেকেই বহন করা।

খেলাফাতে উসমানিয়া যুগের ঘড়ি। যাতে বারোটা সংখ্যার পরিবর্তে বারোটি গুণ ও হেকমতের কথা লেখা ছিলো। যেনো মানব সমাজকে পয়গাম দেওয়া হয়েছিলো, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ঈমানের গুণে ও ছায়ায় অতিবাহিত করার মধ্যেই দুনিয়া, আখেরাতের কল্যাণ নিহিত।

উসমানি খেলাফাত যুগের একটি স্মরণিকা। এই বক্সের মুখ সব সময় খোলাই থাকতো। দানশীল ব্যক্তিগণ এখানে মন খুলে টাকা-পয়সা রাখতেন। আর প্রয়োজনে পতিত ব্যক্তিরা এখান থেকে যখন খুশি টাকা বের করে নিতো।

এ্যারদোগানের সংস্কারমূলক আন্দোলন ব্যক্তি জিন্দেগীর প্রতিটি অংশে কীভাবে পৌঁছলো, এই ফোটো দু' টা এর উত্তর। এতে তুরস্কের শিক্ষা ও আন্দোলনের দু' টি ধারা দেখানো হয়েছে। ১, ইমাম ও খতিব। ২, স্কুল ও হোস্টেল। ইমাম ও খতিবগণ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। তাদের পেছনে মেহনত করার ফলে সমাজের ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য যোগ্য লোক তৈরি হয়ে যায়। আর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার জন্যে হোস্টেল বানিয়ে ছাত্রদেরকে ফ্রীতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে, শিশু, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ সহ সমাজের প্রতিজন সদস্যের অন্তরে ইসলামি চেতনা ও দেশের ভালোবাসা তৈরি হতে থাকে।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বের প্রতি বিশেষকরে ফিলিস্তিনের মাজলুম মুসলিমদের প্রতি তুরস্ক দরদ ও ভালোবাসার অনুভূতি রাখে৷ এটাই সে জাহাজ যা ২০১৬' র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তুর্কি জনগণ তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেছিলো, যা ইহুদিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অবশেষে তীরে পৌঁছেই গিয়েছিলো! যে ভালোবাসার উপঢৌকনকে রুখতে রক্তপিপাসুর দলেরা তুরস্কের জাহাজসহ স্বেচ্ছাচার কর্মী ও নাবিকদের শহীদ করেছিলো!

ইস্তাম্বুলে মুহাজিরদের জন্যে ইজতেমায়ী ইফতারির দিলজুড়ানো দৃশ্য!

এটা সে ঐতিহাসিক মসজিদ যা তুরস্কের এক গরিব মুসলিম বাসিন্দা নিজের রোজগার থেকে জমানো অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তৈরি করেছিলেন৷ তুর্কিদের ঈমান ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ আজও তা দাঁড়িয়ে আছে!

জনগণের মাঝে ইসলামি নিদর্শনাবলীর গুরুত্বরোপ চতুর্দিক দিয়েই করা হচ্ছে। জনগণকে আরবির সাথে সম্পৃক্ত করতে তুর্কি ভাষার সাথে সাথে আরবি ভাষাও লিখে দেওয়া হচ্ছে।

উপরে আয়াসোফিয়ার পুরাতন মসজিদ। আর নীচে দেয়া নকশায় স্যাকুলারিজমের চাপের মধ্যে বসবাস করেও এ্যারদোগান সরকারের হাজার হাজার নতুন মসজিদ নির্মাণের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। ২০১৫ তে যে সংখ্যা ছিলো প্রায় নয় হাজারের কোটায়!

পুরোনো মসজিদসমূহের দেখাশোনা এবং নতুন নতুন দৃষ্টিনন্দন মসজিদ তৈরি করা তুর্কিরা খুবই পছন্দ করে। আয়াসোফিয়ায় শতো বাধা সত্ত্বেও আজান ও নামাজের জন্য খুলে দেয়া এবং সমগ্র

রাষ্ট্রতেই মসজিদসম্পৃক্ত নেজামের পরিবেশ তৈরি করা তুর্কি সরকারের অনন্য কীর্তি!

খেলাফাতে উসমানিয়ার শেষ যুগেও উসমানি বীর মুজাহিদদের মাঝে কতো বড় বড় বীর সাহসী মুসলিম পয়দা হতো, এর এক দৃষ্টান্ত হলেন, সাইয়্যেদ দানবাশী। সঙ্গের সকল যোদ্ধারা শহীদ হয়ে যাবার পরও ক্লান্ত ও আহত শরীরে বারুদভর্তি ভারী বোমা নিয়ে একাই ধ্বংস করে দিয়েছেন বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজ! তুর্কি সরকার তাঁর স্মরণে সেই দিনটির তারিখ হিসেবে একটি ইউনিভার্সিটিও প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইস্তাম্বুল থেকে দামেশক গমনকারী এই বাস খেলাফাতে উসমানিয়া

যুগের এক স্বরণিকা হয়ে এখনো বিদ্যমান আছে। যে যুগে তুর্কি খলিফাগণ আরব, আজমের তিন মহাদেশে নিজেদের দাপটে ইসলামি নেজাম পরিচালনা করতো!

এই ফোটোতে রাসুলে কারিম সা.' র প্রতি তুর্কিদের ভালোবাসার

নমুনা দেখানো হয়েছে। তুর্কিদের জাতীয় গান ৫৭১ হিজা এবং ১৪৫৩ টি অক্ষরে রচনা করা হয়েছে। ৫৭১ দ্বারা রাসুলে কারিম সা.' র জন্মের খৃস্টপূর্ব সন এবং ১৪৫৩ দ্বারা ইস্তাম্বুল বিজয়ের ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে!!

ঐতিহাসিক বসফরাস প্রণালীর মনোরম দৃশ্য [২৪]

---

[২৪] **বসফরাস প্রণালী**

বসফরাস একটি জলপ্রণালী যা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যবর্তি অঞ্চলের একটি অংশে সীমানা নির্দেশ করে। এটিকে অনেক সময় ইস্তানবুল প্রণালীও বলা হয়। বসফরাস, মারমারা উপসাগর এবং দক্ষিণ পশ্চিমের দার্দেনেলাস প্রণালী মিলে তুর্কি প্রণালী গঠিত। বসফরাস প্রণালী বিশ্বের নৌ চলাচলে ব্যবহৃত সবচেয়ে সরু জলপথ। বসফরাস প্রণালী কৃষ্ণ সাগরকে মারমারা উপসাগরের সাথে যুক্ত করেছে। বসফরাস প্রণালীর দুপাশে দু'টি করে চারটি বাতঘর দ্বারা এর সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সীমানার মধ্যে বসফরাস প্রণালীর দৈর্ঘ্য ৩১

কিলোমিটার। উত্তরের অংশে এর প্রস্থ ৩৩২৯ মিটার এবং দক্ষিণের অংশে প্রস্থ ২৮২৬ মিটার। বসফরাসের সর্বোচ্চ প্রস্থ ৩৪২০ মিটার এবং সর্বনিম্ন প্রস্থ ৭০০ মিটার। সর্বনিম্ন প্রস্থের অংশে নৌ ও ফেরি চলাচল খুবই বিপজ্জনক। কারণ এখানে জলযানের দিক বাক নেয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আগত জলযান দেখা যায় না। এ সমস্যাটি এখানে আরও বেশি প্রকট কারণ, বসফরাস দিয়ে প্রচুর জলযান যাতায়াত করে। এটি ২০04 এর এপ্রিলে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে গৃহীত হয়।

বসফরাসের গভীরতা ১৩ থেকে ১১০ মিটারের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এর গড় গভীরতা ৬৫ মিটার। গোল্ডেন হর্ন বসফরাস প্রণালীর একটি মোহনা। এটি অতীতে ইস্তানবুলের পুরোনো অংশকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে দুর্গপরিখা হিসেবে কাজ করতো। এছাড়া এখানে উসমানীয় সাম্রাজ্যের নৌবাহিনীর জলযান নোঙ্গর বাঁধার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত।

বসফরাস নামটি গ্রীক Bospor os থেকে এসেছে। বিংশ শতকের পূর্ব থেকেই এটি মানুষের জানা ছিল যে, কৃষ্ণ সাগর এবং মারমারা উপসাগর পরস্পর একটি গভীর পানিপথ দ্বারা যুক্ত। এই পানিপথটি ভূপৃষ্ঠের থেকে দৃশ্যমান জলের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ২০১০ এর আগস্টে জানা যায় যে পানির নিচ দিয়ে প্রবাহিত এই চ্যানেলটি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম নদী হতে পারতো যদি এটি ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হত। বসফরাসের তীরবর্তী কিছু অংশে কংক্রীট দিয়ে শক্ত করা হয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গায় মাটির অবক্ষেপ পড়ে, সেখানে নিয়মিত ড্রেজিং করা হয়।

বসফরাসের কৌশলগত গুরুত্ব

বসফরাস প্রণালী কৌশলগত কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রপথে রাশিয়া ও ইউক্রেনে যাওয়ার জন্য এটি অন্যতম পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটিকে অধিকার করার জন্য আধুনিক ইতিহাসে বেশ কয়েকটি সংঘাত হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম রাশিয়া-তুরস্ক যুদ্ধ ১৮৭৭-১৮৭৮। ১৬ থেকে ১৮ শতকের মধ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্য সমস্ত কৃষ্ণ সমুদ্র এলাকার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেয়। এই সমুদ্র অঞ্চলে তখন রাশিয়ার সকল যুদ্ধ জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

পরবর্তিতে বসফরাস দিয়ে জলযান চলাচলের ব্যাপারে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালে সম্পন্ন হয় সেইভ্রিস চুক্তি। এই চুক্তির অধীনে বসফরাসকে সকল ধরনের সামরিক নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত করা হয় এবং একে লীগ অফ নেশন্স এর নিয়ন্ত্রণে এনে জলপথে আন্তর্জাতিক চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ১৯২৩ সালের লিউসিন চুক্তিতে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। এতে বলা হয়, বসফরাস প্রণালী ভৌগোলিকভাবে তুরস্কের অধীনে থাকলেও এ পথে যেকোন দেশের জলযান নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবে। কিন্তু তুরস্ক এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বসফরাস প্রণালীতে সামরিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। ১৯৩৬ সালের মনট্রিক্স কনভেনশনে বলা হয় বসফরাস প্রণালী আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হলেও তুরস্ক এই পথ দিয়ে কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের দেশ ব্যতীত অন্য সব দেশের নৌ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তুরস্ক নিরপেক্ষ অবস্থানে ছিল। তখন দার্দেনেলাস প্রণালী সকল যুদ্ধরত দেশগুলোর জাহাজের চালাচলের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন সম্মেলন চলাকালে সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন রাশিয়ার সামরিক বেসকে বসফরাস ও দার্দেনেলাস প্রণালিতে অবস্থানের জন্য তুরস্ক সরকারকে অনুমোদন দেয়ার অনুরোধ

জানায়, যদিও তুরস্ক এই যুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিল না। এই ঘটনা এবং তুরস্কের কারস, আর্তভিন ও আরদাহান প্রদেশ পুনরায় ফিরে পাওয়ার জন্য স্ট্যালিনের দাবি করে–এগুলো ছিল বিভিন্ন কূটনৈতিক সম্পর্কে তুরস্কের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা থেকে দূরে সরে আসার কারণ। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে তুরস্ক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুরস্ক কোন সশস্ত্র কার্যকলাপ সংঘটন করেনি।

সাম্প্রতিক কালে তুরস্কের জলপ্রণালী তেল শিল্পের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাশিয়ার তেল রপ্তানিকারকরা নভোরোসিসিস্ক্ থেকে বসফরাস ও দার্দেনেলাস হয়ে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে তেল পরিবহন করে। (সূত্র: উইকিপিডিয়া বাঙলা)

বসফরাসকে ঘিরে তুর্কি সরকারের রয়েছে বিশাল পরিকল্পনা। ২০২৩' র পর লিসান চুক্তি শেষ হলে তুরস্ক বসফরাসে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা কিংবা ভিন্ন কোনো শর্তারোপ করে কিনা, তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করছেন!

(দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধটির অধিকাংশই উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া। প্রবন্ধের গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে সংযোজন করা হলো, অনুবাদক)

ঐতিহাসিক লুজান চুক্তি [২৫]

---

[২৪] **লুজান চুক্তি এবং ২০২৩**

তুরস্ক ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনস্থল। হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে তুরস্ক বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত একটি দেশ। তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেফ এরদোগান। তাঁরই শাসনামলে তুরস্কের রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনীতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সারাবিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে৷ প্রেসিডেন্ট এরদোগানের বিভিন্ন ভূমিকা ও সিদ্ধান্তের কারণে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে একদিকে যেমন তিনি তুমুল জনপ্রিয়, অন্যদিকে গোটা পশ্চিমা বিশ্বের নিকট চরম সমালোচিত।

প্রায় ৭০০ বছর ধরে উসমানীয় খেলাফত বা অটোমান সাম্রাজ্যের শাসনের কেন্দ্রভূমি ছিলো তুরস্ক। ইস্তাম্বুল শহরে বসে ইউরোপ, উত্তর অফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশাল এলাকা শাসন করতেন উসমানি খলিফাগণ৷ খলিফা হিসেবে সারা মুসলিম বিশ্বে ছিলো তাদের জয়জয়কার। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান সম্রাজের পরাজয়ের পর ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের সাম্রাজ্যের ইতি ঘটে। জন্ম হয় সেকুলারিজমে বিশ্বাসী আধুনিক তুরস্কের। ফলশ্রুতিতে, রাতারাতি মুসলিম বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারায় তুরস্ক। আধুনিক তুরস্কের গঠন, অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ও তুরস্ককে শতবৎসরের জন্য বিকলাঙ্গ করা আর পরাধিনতার শিকলে বাঁধতে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক লুজান চুক্তি। যেনো তুরস্ক নতুন কোনো ইসলামি পরাশক্তির রূপ ধরতে না পারে!

১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে স্বাক্ষরিত হয় **১ম** বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তকারী লুজান চুক্তি। অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি তুরস্কের প্রতিনিধি এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, গ্রিস, রোমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও ইতালির প্রতিনিধিদের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো। লুজান চুক্তি অনুসারে একদিকে যেমন অটোমান সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে উঠে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি তুরস্কের উপর আরোপ করা হয় বেশকিছু

বিধিনিষেধ। শতবর্ষের এ চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক যাতে আগামী একশো বছরের জন্য পশ্চিমাদের সামনে মাথা তুলে না দাঁড়ায়, তা সুনিশ্চিত করা হয়।

চুক্তি অনুসারে, আধুনিক তুরস্কের সীমারেখার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শাসনকৃত এলাকা মিত্রবাহিনী নিজেদের অধীনে নেয়। ফলে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়৷ পুরোনো সুবিশাল তুর্কিস্থান ভেঙ্গে গঠিত হয় আধুনিক তুরস্কের নামে ছোট্ট একটি খণ্ড রাষ্ট্র৷

চুক্তির শর্তাদী

এই চুক্তিটি করা হয় তুরস্কে প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য৷ লুজান চুক্তিতে তুরস্কে গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিস্টান সংখ্যালঘু এবং গ্রিসে মুসলিম সংখ্যালঘুদেরও সুরক্ষা দেয়। চুক্তির ১৪ অনুচ্ছেদে ইম্ব্রোস (গোকসিয়াদা) এবং টেনিডোস (বোজকাডা) দ্বীপপুঞ্জকে তুর্কি থেকে পৃথক করে একটি ' স্বাধীন প্রশাসনিক এলাকা' হিসেবে অনুমোদন দেয়, তুর্কি সরকার ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ সালে যা বাতিল করে দেয়।

লুজান চুক্তিতে তুরস্ককে সাইপ্রাসের পরাজয় আনুষ্ঠানিকভাবে মানতে বাধ্য করা হয়৷ (যা ১৮৭৮ সালে বার্লিন সম্মেলনের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে ভাড়া দিয়েছিলো, তবে পরবর্তিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত তা অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধিনেই ছিলো)৷

মিশর এবং অ্যাংলো- মিশরীয় সুদান (উভয়টাই ১৮৮২ সালে উরবি বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে ব্রিটিশ বাহিনী দখল করে৷ তবে আইন অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত অটোম্যার সাম্রাজ্যের অধিনেই ছিলো) একতরফাভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে প্রদান করে৷ মসুলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ' লিগ অফ নেশনস' ' র হাতে অর্পণ করা হয়।

তুরস্ক ডডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে তার সমস্ত দাবী থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়৷ ১৯১২ সালে যা ইতালি- তুর্কি যুদ্ধের (১৯১১- ১৯১২) পরে ' ঊশী' চুক্তির ২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ইতালি তুরস্কের কাছে অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলো।

এছাড়া তুরস্কের পক্ষ থেকে বসফরাস প্রণালীকে গ্রিস ও ইউরোপের জন্য বিনা বাধায় টেক্সহীন জাহাজ চলাচলের অনুমতি নিশ্চিত করা হয়!

চুক্তিধারা

লুজান চুক্তিতে ১৪৩ টি ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিলো৷ যা বিভাগে বিভক্ত ছিলো৷ পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে ' মন্ট্রোক্স' চুক্তির মাধ্যমে সংশোধন করা হয়৷ তখন লুজান চুক্তির বিভিন্ন ধারাগুলো দু' পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে বাতিলকরণের পাশাপাশি গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে জনসংখ্যার বিনিময় বিষয়ক যৌথ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে৷ এই চুক্তির শর্তাবলীতে তুরস্কের স্বাধীনতা, সীমানা নির্ধারণ, তুরস্কের গ্রীক অর্থোডক্স খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ও গ্রিসে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার কথাও উল্লেখ করা হয়৷ (সূত্র: বিস্তারিত পড়ুন ' উইকিপিডিয়া আরবি')

২০২৩ সালের পর কী করবে তুরস্ক?

২০২৩ সালের মধ্যে তুরস্ক নিজেদের অর্জনের অনেক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি, পররাষ্ট্র, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো, পর্যটন সহ সকল ক্ষেত্রে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছানোই তুরস্কের লক্ষ্য৷ অর্থনীতিতে বিশ্বের প্রধান দশ পরাশক্তিতে পরিণত হওয়া তুরস্কের প্রধান টার্গেট৷ শিক্ষা ক্ষেত্রে তুরস্ককে বিশ্বের উন্নত শিক্ষাকেন্দ্রের রূপ দেওয়া অন্যতম

উদ্দেশ্য। ২০২৩' র পরে লুজান চুক্তি শেষ হলে বসফরাস প্রণালী পুনরায় সম্পূর্ণরূপে তুরস্কের করায়ত্বে চলে আসবে। তুরস্ক চাইলে তখন ট্যাক্সহীন কোনো জাহাজ চলাচলের অনুমতি না দেওয়ারও ক্ষমতা রাখবে! এভাবে মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপেও তুরস্কের প্রভাব বহু গুণে বেড়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা!

লক্ষ্যের পথে কতোটা এগিয়েছে তুরস্ক?

আর তিন বছর পরই আসবে ২০২৩ সাল। এর মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ অর্জনের পথে তুরস্ক অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। প্রতিবেশী অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ, বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা এবং সর্বশেষ করোনা সংক্রমণের কারণে তুরস্কের অগ্রগতি বেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেশটি নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

তুরস্কের এক সময় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটার একটি ব্যাধি ছিলো। গত দু' দশক ধরে সেই ব্যাধি থেকে দেশটি মুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। সর্বশেষ ২০১৬ সালের ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের পর এ ধরণের প্রবণতা অনেকখানি কমে এসেছে। তুরস্কে এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পেরেছে যেখানে প্রকৃতই জনসমর্থনের প্রতিফলন ঘটে। ক্ষমতাসীন একেপির অধীনে হওয়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দেশটির সবচেয়ে বড় তিন সিটির নির্বাচনে শাসক দল পরাজিত হয়েছে। দেশটির গণতন্ত্র চর্চা নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে নানা ধরণের সমালোচনা সত্ত্বেও সেখানে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার এক ধরণের সমন্বয় ঘটেছে। অনেকে তুর্কি শাসনব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা আর উদার গণতন্ত্রের একটি সমন্বিত মডেল হিসেবে বিবেচনা করেন। মধ্যপ্রাচ্যের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের এ অঞ্চলে তুরস্ককে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর পাশে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে।

অনেক সমালোচক মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্ক উসমানীয় খেলাফতের পুরোনো সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে। এই অভিযোগ এনে মধ্যপ্রাচ্যে মিসর, সৌদি আরব, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সমন্বয়ে একটি অক্ষও তৈরি করা হয়েছে; যার সাথে ইসরাইলের রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র।

এ কথা সত্যি যে, লুজান চুক্তির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে তুরস্ককে সঙ্কুচিত এক দেশে পরিণত করা হয়েছে। এমনকি মসুল, ইদলিব, আফরিন, রাক্কার মতো তুর্কি ঐতিহ্যের শহরকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। লুজান চুক্তির অবসানের পর এসব এলাকাকে তুরস্ক তার মানচিত্রভুক্ত করতে পারে বলেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন। এজিয়ান সাগরের তুর্কি দ্বীপগুলো গ্রিসে স্থানান্তর করা হয়েছে; চুক্তি শেষ হলে তুরস্ক সেগুলো আবার নিজ নিয়ন্ত্রণে নিতে পারে বলে মনে করা হয়। সাইপ্রাসের ব্যাপারে তুরস্ক আবার আগ্রাসী ধরণের পদক্ষেপ নিতে পারে বলেও অনেকে মতামত ব্যক্ত করছেন।

এরদোগান সব সময় একজন স্বপ্নচারী রাষ্ট্রনায়ক হলেও তাকে অবাস্তব উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। তিনি এমন কোনো অপরিণামদর্শী নীতি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না যাতে পুরো ইউরোপের সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হবে। অথবা মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলোর মুখোমুখি হয়ে পড়বেন তিনি। যদিও এরদোগান তার নীতির কারণে মধ্যপ্রাচ্যে বেশ জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব এবং এই অঞ্চলের জনপ্রিয় আন্দোলন মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন! (সূত্র: নয়াদিগন্ত ২৮ জুলাই ২০২০)

সমাপ্ত

অনুবাদক

সাঈদ আহমাদ খান নদভি

নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ

২৪/ ৩/ ২০২০ ইং

বিকেল- ৬.১২

এরদোগানের পররাষ্ট্র কৌশল পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় তিনি বিশ্ব শক্তিগুলোর সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে চলবেন। তিনি ন্যাটোর মধ্যে থেকেই রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে চলছেন। চীনের সাথেও তার রয়েছে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। তুর্কির শক্তি, অখণ্ডতা, অগ্রগতি এবং বিদ্যমান রূপকল্পকে সামনে রেখে এগোতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে তুরস্ক আবার পরিণত হতে পারে একটি অন্যতম বিশ্ব শক্তিতে। যেখানে তুরস্ক বিশ্ব শক্তিতে দাপট দেখিয়ে চলতে পারবে ইনশা আল্লাহ। ২০২৩ সাল নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে একটি বিরাট মাইলফলক.......।

(দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধটির অধিকাংশই আরবি উইকিপিডিয়া থেকে অনুবাদ করা। প্রবন্ধের গুরুত্বের দিকে তাকিয়ে অনুবাদ সংযোজন করা হলো, অনুবাদক)